সী * মা * স্ব * র্গ



সীমাস্বর্গ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫৩



এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স । কলিকাতা বারো

প্রকাশক : শ্রীনির্মলেন্দু ভদ্র
এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ-৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রচ্ছদ-ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেট

মুদ্রাকর : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস, ৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

কথাশিল্পী শ্রীবিমল মিত্র

সুহৃদ্‌বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই—

সমুদ্রের গান

এ' জন্মের ইতিহাস

একটি রঙ করা মুখ

শ্বেতকপোত

সিন্ধুর টিপ

নীলসিন্ধু

এক আশ্চর্য মেয়ে

দেবকন্যা

জনপদবধূ (যন্ত্রস্থ)

জলকন্যার মন (যন্ত্রস্থ)

"সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি তম কাময়িথ বালানশেয়ে দেবদীনে নাম লুপদখে”……অর্থাৎ সুতনুকা নামে এক দেবদাসী ভালবেসেছিল বারানসীর দেবদীন বা দেবদত্ত নামে এক রূপদক্ষকে।

তারপর কতো রূপাবর্তন ঘটে গেছে বিশ্বে, কতো নদী তার স্রোত পরিবর্তন করেছে, কতো জনপদ ধ্বংস হয়েছে—তবু দু'হাজার বছরের শিলালিপি যোগিমারার সেই নিভৃত গুহায় আজো ঘোষণা করছে—সুতনুকা-দেবদাসী ভালবেসেছিল শিল্পী দেবদত্তকে।

কোনো নাট্যকার ভবভূতি রচনা করেননি মালতীমাধব, শ্রীহর্ষ রচনা করেননি রত্নাবলী, শূদ্রক প্রস্তুত করেননি মৃচ্ছকটিক, কালিদাস রচনা করেননি বিক্রমোর্বশী, মহাকবি ভাসও হাত দেননি তাঁর চারুদত্ত নাটকে। কোথা থেকে, বারানসীর কোন্ পল্লী থেকে এসেছিল দেবদত্ত—যোগিমারার শৈলগুহাকার নাট্যমণ্ডপে কোন্ পরম লগ্নে তার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সুতনুকার অপরূপ রূপমাধুর্য—তার নিরীখ যারা দিতে পারত কোথায় বিলীন হয়ে গেছে তাদের কল-কাকলী এই দু'হাজার বছরে, শুধু মহাকালের দুর্গতোরণে আজো বেঁচে আছে দুটি নাম, সুতনুকা আর দেবদত্ত। না, শুধু নাম নয়, তার থেকেও বেশী তার থেকেও অত্যাশ্চর্য ঘটনা। সুতনুকা ভালবেসেছিল দেবদত্তকে। সুতনুকা দেবদত্তও বেঁচে নেই, এমন কি তাদের নামের মূল্যও কিছু নয়, যেটা বড়ো, যেটা কালোত্তীর্ণ—সেটা হচ্ছে তাদের ভালোবাসার কাহিনী, একটি পুরুষ ভালোবেসেছিল একটি নারীকে। সুতনুকা না হয়ে মেয়েটির নাম হতে পারত মৃদুলা—দেবদত্ত না হয়ে পুরুষটির নাম হতে পারত—

সেদিনকার মধ্যরাত্রিও বোধহয় এমনি জ্যোৎস্নামুখর ছিল। উত্তরে

বঙ্গের ধূ-ধূ প্রান্তরের অস্ফুট জ্যোৎস্না আজ এক অদ্ভুত মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে। শুভ্র মেঘগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রান্তরের ঊর্ধ্বলোকে। না, ঠিক ছড়িয়ে পড়া নয়, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে লক্ষ্যে পড়বে, অদ্ভুত শৃঙ্খলার সঙ্গেই মেঘখণ্ডগুলি দণ্ডায়মান, তাদের নিম্নদেশে যেন অদৃশ্য কোনো সমান্তরাল রেখা টানা রয়েছে এক! মনে হচ্ছে, অদৃশ্য কোন রঙ্গমঞ্চের ওপরে বিভিন্ন দৃশ্য-দ্যোতক শাদাকালো রঙে রাঙানো হাল্‌কা-হাল্‌কা কাঠের খণ্ডগুলি রয়েছে সারি সারি সাজানো, যার আড়াল থেকে এখুনি মঞ্চপ্রবেশ করবে নাটকের পাত্রপাত্রী!

লৌহপথ একটা বিশিষ্ট লয়ে ঝংকার তুলে আমাদের নিয়ে চলেছে উত্তর-বঙ্গের প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। আর জানালার পাশে রাতজাগা পাখীর মতো বসে থাকতে থাকতে সেই লয়ে লয় মিলিয়ে বারবার আমা.. মন বলছে—সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি—সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি—সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি—

দু'হাজার বছর আগের সেই জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাত্রে যোগিমারা-সীতাবেঙ্গার শৈলগুহাকার নাট্যমণ্ডপে সেদিন কোন্ নাট্যকারের কোন্ অভিনব নাটক অভিনীত হয়েছিল কে জানে! অভিনয়ান্তে নিভে গেছে পাদপ্রদীপের সারি সারি উজ্জ্বল শিখাগুলি, ফিরে গেছে সমাগত দর্শকমণ্ডলী। হরিদ্রা আর রক্ত-কিংশুক-রেণুর মুখপ্রলেপ সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, দেবদত্তের হাত ধরে, আজকের রামগড় পাহাড়ের উত্তরভাগে 'হাতিপোল' নামে যে সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মটি বিদ্যমান, সেটি পার হয়ে আজকের দিনে যে গুহাটিকে 'যোগিমারা' বলা হয়ে থাকে, সেটির সামনে এক নিভৃত শিলাতলে এসে হয়ত বসেছিল সুতনুকা। সেই দু'হাজার বছর আগে রূপকার দেবদত্তের দুটি হাত নিজের ছোট পেলব দুটি মুঠির মধ্যে নিয়ে হয়ত আজকের কোনো নারীর মতই বলে উঠেছিল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

আজকের কোনো কোমলপ্রাণ শিল্পীর মতই দু'হাজার বছর আগেকার শিল্পী দেবদত্তর কণ্ঠ হয়ত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দুরন্ত অভিমানে, চোখের কোণও হয়ত হয়ে উঠেছিল সজল, বলেছিল, আমার প্রেমের এতবড়ো অসম্মান তুমি করলে কেমন করে, সুতনুকা ?

আরও ঘন, আরও লীলায়িত হয়ে দেবদত্তর কাছে সরে বসেছিল হয়ত সুতনুকা, একটু হেসে বলেছিল, কী করেছি ? অপর পুরুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছি ? পাদপ্রদীপের সামনে সে ত বারংবার আমাকে হতে হয়েছে, কী করবো বলো !

আজকের-প্রেমিক কোনো রূপকারেব মতোই দু'হাজার বছর আগেকার রূপকার দু'হাতে প্রেয়সীকে হয়ত নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠেছিল, তাতে ত কোনোদিন আমাব বুক এমন করে কেঁপে ওঠেনি ! নেপথ্য-গৃহে বীণকার সুর-গন্ধর্ব সাপের মতো দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকায়, তুমি সম্মোহিতার মতো উঠে ধীবে ধীরে চলে যাও কোনো স্তম্ভের আড়ালে, দূব থেকে তোমাদের পরিচ্ছদের অংশ দেখতে পাই। কিন্তু আজ, আমি এসে পড়ায় তার হাত ছাড়িয়ে চট্ করে সরে দাঁড়ালে কেন ? আর কেনই বা সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভিতরটা উঠল মোচড় দিয়ে ?

খিল্‌খিল্ করে আজকের কোনো রহস্যময়ী নাবীর মতোই হয়ত হেসে উঠেছিল সুতনুকা, তারপবে দুটি মৃণাল ভুজলতিকায় দেবদত্তের কণ্ঠদেশ আকর্ষণ করে তাঁর অধরপ্রান্তে মুদ্রিত করে দিয়েছিল প্রগাঢ় চুম্বন, বলেছিল, ভুল করো না, কাঞ্চন ফেলে আঁচলে আমি কাঁচ বাঁধবো না !

ঝিম্‌ঝিম্—ঝম্‌ঝম্ করে তখনো লৌহপথ দিয়ে পার হচ্ছি প্রান্তর। ছোট কামরাটিতে আমি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই—ওপরে নিচে যে যেখানে পেরেছে স্তূপীকৃত বাক্স আর বাঁধা-বিছানার এপাশে-ওপাশে নানান ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। আমার পায়ের কাছে হারমনিয়ামের বাক্সটা,

তার ওপরে গোলাপী কাপড়ের আবরণে ঢাকা সেতারটা পড়ে আছে। আমার সামনের বেঞ্চিতে যতীনবাবু জানালায় মাথা রেখে পা-টা মেক-আপ বাক্সের ওপর তুলে দিয়ে নিদ্রামগ্ন। তাঁর ওপাশে খোঁপা-ভাঙা কেশের রাশি ছড়িয়ে দিয়ে একটা স্ফীত হোল্ড-অলের ওপর মুখখানা কাৎ করে রেখে উপুড় হয়ে হাঁটুমুড়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুয়ে আছে আমাদের রাণীদিদি। রাণীদিদি বলে স্নেহভরে আমি ওকে মাঝে মাঝে ডাকি, বয়সে আমার থেকে ও ঢের ছোট, মাত্র সপ্তদশী, আমাদের আর সব মেয়ের মতো ওর সিঁথিতে রক্ত-চিহ্ন এখনো পড়েনি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর মুখখানা—গোপনে বোধহয় কেঁদেছিল, নিমীলিত চোখের কোণ থেকে সুকোমল কপোল পর্যন্ত একটা অশ্রুরেখা শুকিয়ে আছে। কেন এ ক্রন্দন আমি জানি, কিন্তু আমার এ-পুঁথির পৃষ্ঠায় ছাড়া কোথাও বলতে পারি না, বলে লাভও নেই, অন্য কেউ তা বুঝতেও চেষ্টা করবে না। আমরা ক'জন ছাড়া আমাদের আর সবাই উঠেছে অন্য কামরায়। সঞ্জয়ও আসতে পারত হয়ত এ-কামরায়, কিন্তু আসেনি। এলে হয়ত আমার রাণীদিদির চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠত না এমনভাবে!

কলকাতা থেকে যখন সদলবলে রওনা হয়েছিলাম উত্তর-বঙ্গের দিকে—কয়েকটা স্টেশন পর্যন্ত সঞ্জয় ছিল আমাদের কামরায় আমার বিপরীত কোণে বসে, রাণীদিদি ছিল পাশে। কেমন যেন অস্থির-অস্থির হয়ে উঠছিল সে, তারপরে থাকতে না পেরে নিম্নকণ্ঠে আমাকে বলেছিল, ও কেন এ কামরায় এলো দাদা? বারবার বলেছি, এমনতরো কখনো করো না, তা কিছুতেই ও শুনবে না!

একটু হেসে বলেছিলাম, এ আবার তুই কি বলছিস!

—ঠিকই বলছি দাদা। দেখ না কেমন করে তাকাচ্ছে, আমিও না তাকিয়ে পারব না, সবারই চোখে পড়বে শেষ পর্যন্ত, হাসাহাসি আর অপবাদের সীমা থাকবে না!

বলেছিলাম, রাণীদি, এ এক অদ্ভুত জগতে এসে পড়েছিস ভাই! অপবাদ এখানকার মাথার ভূষণ!

হঠাৎ আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল, কেন, কী করেছি আমি! এমনকরে ওরা সব বলে কেন! আমাকেও বলে, ওকেও বলে!

এদিক-ওদিক থেকে ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছিল কলরব, দু'একজন এগিয়েও এসেছিল কাছে, সমবেদনা যতটা নয়, প্রচ্ছন্ন কৌতূহল তার থেকে বেশী। কী হলোরে রাণী, কী হলো?

বলে উঠেছিলাম, কিছু না, চোখে ওর ইঞ্জিনের কাঁকর পড়েছে!

ট্রেনটা ততক্ষণে কী একটা স্টেশনে এসে থেমেছিল; ধীর পায়ে চুপচাপ কামরা থেকে নেমে গিয়েছিল সঞ্জয়।

কামরার বাঁদিকে মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছে আমাদেরি একটি লোক, বাঙ্কেও দু'তিনজন। আর আমার পাশে আমারই বেঞ্চির অপর-প্রান্তে জানালার লোহার গরাদে মাথা রেখে নিদ্রালস শিথিল ভঙ্গীতে এতক্ষণ বসেছিল অঞ্জলি, এইবার রবারের বালিশে মাথা রেখে সংকীর্ণ বেঞ্চির ওপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশ, মুখের ভাব ভারী স্নিগ্ধ! বারংবার ওকে বিভিন্ন বইয়ে দেখা দিতে হয়েছে মায়ের রূপ নিয়ে, মায়েরই মতন চোখ নিয়ে ও পৃথিবীর দিকে তাকায়, সবার প্রতিই স্নেহ। সেবার মাণিকচকের ঘাটে গঙ্গার তীরে আমরা খেয়ার জন্য বসে ছিলাম বহুক্ষণ ধরে—হঠাৎ চোখে পড়েছিল, ছোট্ট এক শিশুগাছের তলায় কয়েকটি শিশু নিয়ে ঘুরছে একটি কুকুর, একটি শিশু তার মরে পড়ে আছে, কিন্তু অবোধ মা তা বুঝতে পারছে না, বার-বার মৃত শিশুটির কাছে সে মুখ নামিয়ে আনছে, ভাবছে, বোধহয় ও ঘুমিয়ে আছে, এইবার উঠে দাঁড়িয়ে ওর স্তন্য অন্বেষণ করবে। অঞ্জলির চোখ ভরে জল এসেছিল এই দৃশ্য দেখে, তারপরে ছুটে গিয়েছিল সেই গাছের তলায়। মৃত শিশুটিকে বাঁচিয়ে তোলার সে কী প্রয়াস তার!

অন্য মেয়েরা তাই নিয়ে গা টেপাটেপি করে হেসেছিল, বলেছিল, আদিখ্যেতা !

কিন্তু আমি দেখেছিলাম মাতৃভাবের এক স্বর্গীয় সুষমা ! মনে হয়েছিল, বহু ভাগ্যে আমি দূর থেকে ছিট্‌কে ছুটে এসেছিলাম আবার ওদের এই জগতে, নইলে দু'চোখ ভরে এই যা দেখছি, সমগ্র মন মেলে দিয়ে এই যা অনুভব করছি, তার কিছুই আমাব পাওয়া হতো না !

মাঝের বেঞ্চিটার ওপাবে কামরার অন্য প্রান্তেব বেঞ্চিতে লম্বালম্বি বিছানা পেতে সারা বেঞ্চি জুড়ে শুয়ে আছে নিশীথকুমাব। পুরো নাম নিশীথকুমার চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু উপাধি সে আজকাল ব্যবহার করে না। লম্বা-চওড়া চেহারা, মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্য। শ্যামবর্ণ মুখখানা বসন্তের পদচিহ্নে বিক্ষত হলেও সেখানে তাব যত্নেব ক্রটি নেই। বলে, মুখখানাই সব, আঠাশ নম্বর ম্যাক্সফ্যাক্টর দিয়ে যতই রাঙিয়ে নেই, তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা, ভাব—এক্‌স্‌প্রেশন ! সেটা ত ফোটা চাই ! যতই হাত নেড়ে গান গাই আর যা-ই করি, ভাবপ্রকাশ ঠিকমতো না করতে পারলে আপনারাই বা আমাকে ভালো পার্ট দেবেন কেন ?

'পার্ট'—অর্থাৎ ভূমিকা। লৌহপথ-পরিক্রমার তাল-মান-লয়ে এগিয়ে যেতে যেতে, আর জ্যোৎস্নামায়ায় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে, বার বার আজ মনে হচ্ছে, কে যে কখন কাকে কোন্ ভূমিকায় নামিয়ে দেয় বিশ্বরঙ্গমঞ্চে, তার ঠিকানা কেই বা জানে ! কার ভূমিকা কোন মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে অন্যতর ভূমিকায় গিয়ে দাঁড়ালো, তারই বা হিসাব রাখছে কে ! বছর ত্রিশ-বত্রিশের তরুণ এই নিশীথ, বছর চারেক হলো বিয়ে করেছে, একটি শিশুপুত্রও এসেছে সংসারে, বউটিও নাকি সুন্দরী। ওর বয়সে যেমন সবাই হয়, তেমনিই সাধারণ ছেলে নিশীথ, কিন্তু কোনো-কোনো বিরল মুহূর্তে ওর যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে করে...... কিন্তু থাক, সেকথা যথাসময়েই বলা যাবে।

বিছানা-বাঁধা গোটা তিনেক স্ফীত হোল্ড-অল্ নিশীথের বেঞ্চির পাশে পর পর সাজিয়ে ওরই কাছ ঘেঁসে শুয়ে পড়েছিল সুবালা। ছোট্ট কামরা, কামরা-ভর্তি আমাদেরি সব লোক, ওরই মধ্যে যে-যেখানে যেমনভাবে পারে একটু বসা বা শেষপর্যন্ত শুয়ে পড়ার সুবিধাটুকু করে নিয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের আরেকটি মেয়ে, কাজল, নিশীথের বেঞ্চিরই এক কোণে প্রথমে বসবার স্থান করে নিলেও পরে আমাদেরই কার যেন সাহায্যে সে বাঙ্কে উঠে বাক্স-টাক্স সরিয়ে শুয়ে পড়েছে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে। কাজলকে আমি জানি, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণী মেয়ে, দুটি শিশুর জননী, স্বামী আজ বহুদিন থেকে নিরুদ্দেশ, বহুদিন কেন, বহু বছর। বেঁচে আছে কিনা তা-ও জানা নেই। সিঁথির সিঁদূর মুছে ফেলেছে কাজল, দৃঢ় পদক্ষেপে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে বাঁচতে হবে, তাকে চলতেও হবে। গৃহলক্ষ্মীর রূপে শাঁখা সিঁদূর পরে মাথায় লালপাড় শাড়ীর অবগুণ্ঠন টেনে মঞ্চ-প্রবেশের পূর্বে সে যখন অন্য অনেকের দেখাদেখি আমাকে নমস্কার জানাতে আসে, তখন এক একদিন কী মনে করে যেন প্রশ্ন করে বসে, দেখ ত, দাদা, হয়েছে?

মুখে প্রসন্ন একটা ভাব টেনে এনে বলি, বাঃ! সুন্দর হয়েছে। কিন্তু, মনেমনে জানি, সুন্দর হয়নি, সুন্দর হতেও পারে না। মনেমনে বলি, বিধাতা স্বয়ং তোমাকে যে রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে বোন, তার ওপরে কোনো ম্যাক্সফ্যাক্টরের সাধ্য নেই তোমাকে সুন্দরতর করে তুলতে পারে। কাজল নাম হলে হবে কী, আশ্চর্য গৌর ওর গায়ের রঙ, মুখের ডৌলটিও মনোরম। একদিন বলেছিল, জানো দাদা, একটি ছেলে আমাকে ভালোবাসে, আমাকে বিয়ে করতে চায়!

—বটে! কে সে?

বলেছিল, তুমি তাকে চিনবে না। সবে চাকরীতে ঢুকেছে, রেলের চাকরী। অফিসার গ্রেডে।

—কী নাম ?

—শঙ্কর। শঙ্কর বোস। কিন্তু দাদা, আমার বড়ো ভয় করে। ওর কাছে বসলে বিভোর হয়ে যাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটাও কাঁপতে থাকে দুরু দুরু করে !

—কেন ?

একটু থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে তারপরে ত্রস্ত, চাপা কণ্ঠস্বরে বলেছিল, এখনো জানে না আমি দুটি শিশুর মা, এখনো জানে না এক নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর আমি স্ত্রী !

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলেছিলাম, কেন ওকে সব বলোনি, কাজল ?

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল, বলেছিল, যদি সব স্বপ্ন ভেঙে যায় !

তারপরেই বড়ো-বড়ো দুটি চোখ ওর ভরে উঠেছিল জলে, বলেছিল, তোমাদের পুরুষদের কাছে ভালোবাসা কতটুকু, তা জানি না—কিন্তু আমাদের কাছে ওইটুকুই যে সব ! কাউকে ভালোবেসে কারুর জন্য সর্বস্ব পণ করেই না আমরা জীবন সার্থক করি ! ওর ভালোবাসা আমার মনে ঝড়ের মতো এসে নাড়া দিয়ে বলে গেছে যে আমি নারী। এই অনুভূতিটুকু ভেঙে গেলে আমি যে চুরমার হয়ে যাবো, দাদা ! তাই এতো ভয়, তাই ওকে সব জানাতে গিয়েও জানাতে পারিনি আজও !—অথচ জানাতে আমি চাই, ওকে ফাঁকি দিতে চাই না !

জানালার ধারে বসে অপসৃয়মান প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কতো স্মৃতিই না ছায়াছবির মতো মনের পটের ওপর ভেসে চলেছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে ঐ একটি কথাই কেন যেন [illegible] বারবার লুব্ধ ভ্রমরের মতো মনের দুয়ারে গুন্ গুন্ করে ফিরছে, সুতনুকা নাম দেবদাসীকি—সুতনুকা নাম দেবদাসীকি—

অলস দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে যাই কামরার ভিতরটাতে। কে এক ফরাসী লেখক নাকি রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না, উঁচু জানালার ধারে বসে সারারাত চোখ মেলে রাখতেন নিশীথ রাত্রের প্যারিসের দিকে। কেন যে এই মুহূর্তে সেই ফরাসী লেখকের কথা মনে হলো বলতে পারি না, কিন্তু সুবালার দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে যে অভাবনীয় দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে মনে হলো, স্বপ্ন দেখছি নাকি আমি! পরমুহূর্তেই ভালোভাবে লক্ষ্য করতে গিয়ে মনে হলো, আমার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে! মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে! বুকেব ভিতবটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে!

নিশীথের বেঞ্চির পাশে হোল্ড-অল্‌গুলিতে তলিয়ে-দেওয়া-দেহ সুবালা ধীরে ধীবে কখন যেন বক্ষলগ্ন হয়েছে ওর।

তাড়াতাড়ি মুখখানা সবিয়ে নিলাম জানালার ধাবে, হয়ত জানালা-ঘেঁষে সবে বসলামও। কিন্তু এমন কবছে কেন ভিতরটা? কোন্ এক আরণ্যক ছায়াছবিতে যেন একবার দেখেছিলাম, এক হরিণ শিশুকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধবেছিল একটা ময়াল সাপ—পাকে পাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়িয়ে তাব প্রাণবায়ু বাব করে দিয়ে তারপর তাকে মুখগহ্বরে গ্রাস করে নিচ্ছিল সেই অতিকায় হিংস্র সাপটা! আমার মনে হলো, আমার হৃদ্‌পিণ্ডটাকেও কে যেন ঠিক সেই ময়াল সাপের মতোই সেই মুহূর্তে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে—এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে আমার শ্বাস, এখুনি শেষ হয়ে যাবে আমার সমস্ত স্পন্দন!

ঘুমন্ত অঞ্জলির মাথায় হাত দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে ইচ্ছা হলো, ওঠো অঞ্জলি, ওঠো শীগ্‌গির। যতীনবাবুর হাতটা ধরে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে বলতে ইচ্ছা হলো, সর্বনাশ হলো যতীনবাবু, সর্বনাশ হলো।

কিন্তু অদ্ভুত আমার মন! ওদেরই বা ডাকতে যাবো কেন ওরাই

যা জেগে উঠবে কেন! সুবালা যদি নিশীথের বক্ষলগ্ন হয়েই থাকে, তাতে ওদের কী যায় আসে? কী যায় আসে বিশ্বসংসারের, যদি আমাদের আর সব মেয়ের মতোই চাকুরীজীবিনী সুবালা, নিশীথের বাহু-উপাধানে মাথা রেখে পরম নির্ভরতায় শুয়ে পড়ে থাকে। বাইরে, উধাও প্রান্তরের ঊর্ধ্বে আকাশের কোণে ঐ যে তাবাগুলি দেবালয়ে প্রদীপের মতো জ্বলছে, সুবালাকে দেখে ওদের দীপ্তি এতটুকুও ম্লান হয়নি! দিগন্তব্যাপী বিচ্ছুরিত জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতায় এতটুকুও মালিন্য জাগেনি! তবে? তবে এতে ক্ষতি হলো কার? আমিই বা সুবালার তিবিশটি-বসন্ত-পার-হওয়া জীবনে কোন্ সে পথিক, ওকে অমনভাবে দেখে ধূ ধূ মরুব বুকে দূরন্ত তৃষ্ণার মতো অকস্মাৎ আমার মধ্যে এক হাহাকার উঠল জেগে?

কী করে সব-কিছু ঘটেছিল ভাবতে গেলে আজও অবাক হই। আমাদের নাট্যায়তনেব দোতলায় অফিস ঘরের সামনে যে বক্সের আসনগুলি সাজানো, তারি একটিতে চুপচাপ বসে সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম সেদিন। মঞ্চের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে সব, সরেও গেছে যবনিকা—দৃশ্য-দ্যোতক সমস্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলি সরিয়ে পেছনের দিকে গায়ে-গায়ে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে স্তূপীকৃত করে। সময় খুব কম। যত সত্বর সম্ভব আমাদের নতুন নাটকটি প্রস্তুত করে বেরিয়ে পড়তে হবে বাইরে, উত্তর-বঙ্গ পরিক্রমায়, আমার বন্ধু প্রণবেশের তত্ত্বাবধানে। ইতিমধ্যে পুরাতন যা-কিছু, সব ভেঙেচুরে ফেলে—নতুন রূপ নিয়ে গড়ে উঠবে আমাদের 'পাদপ্রদীপ নাটমঞ্চ'!

কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেয়েছিলাম মৃদু একটা কণ্ঠস্বর, আসতে পারি?

চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখেছিলাম, কালো ব্লাউজের ওপর সাদা

জর্জেটের একটা শাড়ী পরণে, জবিব কাজকবা সাদা একটা ব্যাগ হাতে সস্মিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুবালা।

সাগ্রহে বলেছিলাম, এসো!

বসেনি এসে পাশে, ঠিক পিছনটাতে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার চেয়াবের দুটি পাশ ধবে, বলেছিল, এমনভাবে এখানে বসে যে?

—এমনি।

একটু থেমে একটু হেসেই বলে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত তোমারই নাটকের নায়িকা হতে হবে আমাকে এবাব।

—কেন, আপত্তি আছে নাকি?

আমাব কাঁধেব ওপব ওব হাতখানা বেখে ভারী গলায় বলে উঠেছিল, তাই বই কী! কতো বড়ো ভাগ্যবতী আমি জানো! কবো, নতুন করে সৃষ্টি করো তুমি আমাকে!

আমার কাঁধেব ওপব রাখা ওব হাতখানাব ওপবে আমার হাতটা বেখেছিলাম কয়েক মুহূর্ত, কিছু বলিনি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, যাই।

—কেন? বসো না একটু?

চকিত চোখে চারিদিকে একবাব তাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, না। কেউ দেখে ফেললে যা তা' রটাবে।

একটু আশ্চর্য হয়েই বলে উঠেছিলাম, কেন!

বলেছিল, এ কোন্ জগতে এসে পড়েছো তা তুমি জান না! এরা নিজেরা যা পায়নি, কাউকে তা' পেতে দেখলে হিংস্র হয়ে উঠবে মুহূর্তে, আর, তার প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক!

বলেছিলাম, কিন্তু কী পাওয়ার কথা বলছ সুবালা?

কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল, ভালবাসা।

—তাই কী?

স্বপ্নমুগ্ধের মতো বলেছিল, তুমি আমার সব। সত্যি গো, যা খুঁজছিলাম, তা' পেয়ে গেছি। যাকে খুঁজছিলাম, তাকে পেয়ে গেছি। ওগো, আর আমি কিছু চাই না, আর আমি কাউকে চাই না!

বলতে বলতে ছুটে সরে গিয়েছিল কাছ থেকে, উদ্গত অশ্রু রোধ করতে সম্ভবতঃ।

শান্ত, শীতল জলের অবগাহনে নামলে যেমন সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হয়ে আসে, তেমনি আমার দেহমন যেন ধীরে ধীরে কী এক শৈথিল্যের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কী কী সব ছোট ছোট স্টেশন পার হয়ে গেল ট্রেন, পার হয়ে গেল কতো লণ্ঠনের স্তিমিত, পাণ্ডুর আলো ঘটাং ঘটাং করে এক পথ থেকে আর-এক পথে মোড় ফিরল আমাদের গাড়ী। প্রান্তরের আকাশ থেকে খণ্ড মেঘের দল নাট্যাভিনয় শেষ করে সরে গেল যেন, বিপুল হস্তীযূথের মতো দিগন্তে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে তারা, এখুনি যাত্রা করবে নিরুদ্দেশের দিকে! আকাশপ্রান্তে সমগ্র উদয়-দিগন্ত জুড়ে জ্যোতির প্রথম লিপিরেখার আরক্ত আভাস উঠেছে ফুটে।

আমার ভারি চোখের পাতা ততক্ষণে কিন্তু তুর্নিবার এক অদ্ভুত আলস্যে গেছে ভরে। মনে হলো, ভারী স্নিগ্ধ এক ফুলের গন্ধে সমস্ত অন্তরটা যেন ক্রমে ক্রমে মত্ত হয়ে উঠেছে! চিনেছি সে গন্ধ,—রজনী-গন্ধার সৌরভ! খাটের পাশে রজনীগন্ধার স্তবক, খাটের বাজুতে রজনীগন্ধা! ওর গলায় রজনীগন্ধার মালা, ওর হাতে, ওর বাহুতে, ওর কটিদেশে রজনীগন্ধারই মালা জড়ানো। ঝিলিমিল রূপোর কাজ-করা শুভ্র বেনারসীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করে প্রশ্ন করলাম, তোমার নাম কী খুকী?

সলজ্জ হাসিতে ভরে গেল মুখ, তারপরে তুই চোখের কোণে ঈষৎ তিরস্কারের বিদ্যুতি এনে বলে উঠল, আমার নাম 'খুকী' বুঝি?

—তবে ?

মুখ টিপে একটু হাসল, তারপরে বলল, বিয়ের আগে লুকিয়ে-লুকিয়ে যা বলে ডাকতে, সেই নাম ধরে ডেকো না কিন্তু ভারী লজ্জা করবে !

বললাম, কী নাম ? রতি ?

—যাঃ।

—যাঃ কেন ?

—ওর আগে একটা 'আ' যোগ করে নাও। সে-ই ত আমার আসল নাম।

ওর হাতদুটি হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললাম, শেষ পর্যন্ত এলে আমার ঘরে ?

অল্প একটু হাসল, মুখ নীচু করল, একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপরে বললে, হ্যাগো, তুমি নাকি আমাকে বিয়ে করতে চাওনি ?

—কে বললে !

—শুনেছি।

—কার কাছে শুনেছো ?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামালো, বললো, বাবা একদিন বলছিলেন মাকে। শুনে—

—শুনে ?

বললে, বারে, আমার কান্না আসে না !

—কেন ?

মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে, বলল, পাঁচবছর তোমার জন্য বসে আছি। আমাদের তে-তলার ভাড়াটে সেই সুপ্রভাদি, সে বলতো, পাঁচবছর ধরে আমি নাকি তোমার তপস্যা করছি! তা তপস্যাই বটে !

একটু হেসে বললাম, কেন ?

—কেন !—ও বললে, শাস্তি কী কম দিয়েছ আমাকে ! কতো ভালো লাগত তোমাব কথা শুনতে ! কতো ছল করে আসতাম তোমাদেব বাড়ীতে ! যে-ই বিয়েব কথা উঠল, অমনি বাবু বসলেন বেঁকে। শেষ-পর্যন্ত আমার ওপব বাগ কবেই চাকবী নিয়ে চলে যাওয়া হলো দূবদেশে !

—না গো, তোমাব ওপব রাগ কবে নয়।

—তাই বই কী ! অভিমানে স্ফুবিত অধব, আরতি বললে, এপক্ষ-ওপক্ষ সবাই রাজী, তুমি বেঁকে বসেছিলে কেন ? আমি জানি, আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি !

—দূর বোকা ! ওকে দুহাতে একেবাবে কাছে টেনে নিলাম, বললাম, ও কথা বলে না !

মুহূর্তে চোখ ছলছল কবে এলো ওব, ধবাগলায় কোনক্রমে বললে, কিন্তু আমি ত পারলাম না ! এই পাঁচবছবে কতো সম্বন্ধ এলো আর গেল, আমি ত কোথাও মাথা নোয়াতে পাবলাম না ! জানি, আমার যদি হও, তুমি নিশ্চয়ই আসবে আমাব কাছে ফিরে !

—এসেছি ত ?

পরম সুখে, পরম নির্ভরতায় আমার বুকে মুখ লুকালো, বললে, হ্যাঁ, তা এসেছো।

রিম্‌ঝিম্‌-রিম্‌ঝিম্‌—সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জুড়ে একটানা একটা সুব বেজে চলেছে, সমস্ত শরীব ভবে একটা জুড়িয়ে যাওয়া আবামের স্নিগ্ধতা ! মাথায় বুঝি লাগছে এসে হু-হু হাওয়া—আর পেলব কোনো পাখীর বুক যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার উত্তপ্ত মাথার চুল ! বহুদূর-থেকে ভেসে-আসা কাকের কা-কা, আর ছোটপাখীর কিচিরমিচির যেন এসে ছুঁয়ে

যাচ্ছে চেতনার তারগুলিকে। তারগুলি ঠিক বেজে উঠছে না ললিত ঝংকারে, শুধু থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দেয়াল-ঘেরা ঘর, বিবর্ণ, নোনাপড়া—সেই ঘর পেরিয়ে আরেকটা ঘর, সেই ঘরের সামনে বারান্দা। বড়ো বড়ো কয়েকটা বালিখসা থাম দাঁড়িয়ে আছে যেন বিচিত্র ইতিহাসের দুঃসহ বোঝা মাথায় নিয়ে। টিম্‌টিমে একটা লণ্ঠন ঝুলছে একটা থামের গায়ে-ঠুকে-দেওয়া পেরেকের ওপর। আর ওদের কাছে ছিল একটা স্নিগ্ধশিখার রেড়ির দীপ—আর আমার খুব কাছে আসনের পাশেই জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল বেশ বড়ো এক পিতলের পুত্তলিকার হাতে পঞ্চপ্রদীপ। বুকে কাঁচুলী, কটিতে মেখলা, পায়ে নুপুর, হাতে কেয়ূর, কঙ্কন, গলায় শতনরী, মাথায় সিঁথির দুধারে চন্দ্র ও সূর্যের প্রতীক দুটি গোলাকার গহনা। উড়িষ্যার সৈকতে কোণার্কের যুগে যখন সূর্যমন্দিরে এসে নামত বিদেশী বণিক—হাতে প্রদীপ নিয়ে, পায়ের নুপুরে ঝঙ্কার তুলে মদির নৃত্যলীলা দিয়ে অভ্যর্থনা করত যে দেবদাসী, সে-ই যেন স্বর্গলোকের কোনো নিষ্ঠুরতম শাপে পিতলের পুত্তলিকা হয়ে আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে সেরাত্রে বিকীরণ করছিল পঞ্চপ্রদীপের শিখায়িত আলো!

পুরোহিত কখন আমার হাতে তার হাতখানা তুলে দিয়েছেন মঙ্গল-ঘটের আম্রপল্লবের সংলগ্ন করে, কখন শুরু করেছেন তাঁর মন্ত্র, কে জানে! আমি তখন শুধু স্তম্ভিত হৃদয়ে পুত্তলীকৃত সেই দেবদাসীর বিচিত্র অলঙ্করণ লক্ষ্য করে চলেছিলাম। বিশেষ কোনো ঘটনার স্মৃতি যখন মনকে আলোড়িত করে, তখন দেখেছি, সেই ঘটনার পাশাপাশি তারই সম্পর্কিত কোনো তুচ্ছ জিনিস অথবা তুচ্ছ কোনো কথা মনের মধ্যে এমন দাগ কেটে বসে যায় যে, তার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলা অসম্ভব। আমার জীবনের অতবড়ো একটা ঘটনা, কিন্তু যা হুবহু মনে গেঁথে আছে, তা হচ্ছে সেই ঐ হাতে-প্রদীপ স্তব্ধবাক নিশ্চল দেবদাসীটি!

নামাবলী-গায়ে বৃদ্ধ পুরোহিত কেমন যেন টানাটানা ঘুম-ঘুম কণ্ঠস্বরে বলে চলেছেন, যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।—হাতের মধ্যে মুহুমুহু কেঁপে-ওঠা কোমল হাত-খানিতে সবার অলক্ষ্যে একটু চাপ দিয়ে আমি বলে উঠেছিলাম, এই যে তোমার হৃদয় তা আমার হোক্, আর এই যে আমার হৃদয়, তা তোমার হোক্!

লাল চেলী-পরা মূর্তিটিব পাশ ঘেঁসে বসেছিলেন বর্ষিয়সী এক মহিলা। চওড়া লাল পাড় সাদা শাড়ীর ঘোমটা কপালের প্রান্ত পর্যন্ত টেনে। আর আমার কাছে বসেছিলেন সুব্রতদা, গায়ে খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী। কালো-কার-ঝোলানো পকেট ঘড়িটা বার কবে বার বার সময় দেখছিলেন, এটুকু বেশ মনে আছে। সুব্রতদা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আজ বহুদিন। তাঁকে আমি শেষ দেখেছিলাম কী একটা ছায়াছবিতে যেন। বৃহৎ কোনো আদালতে 'জজ্' সেজে বসেছিলেন উঁচু আসনের ওপরে। ছোট একটা হাতুড়ী ঠুকে বারবার কাদের উদ্দেশে যেন গর্জন করে উঠছিলেন, 'অর্ডার, অর্ডার'!

স্মৃতি আর স্বপ্ন, স্বপ্ন আব স্মৃতি, সব যেন একাকাব হয়ে গেছে জীবনে! অজস্র আরোহীর কল-কোলাহল নিয়ে স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবার পর আবার যখন ছেড়ে চলে যায়—মিলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের ব্যস্ততা, শূন্য লৌহপথ আবার তেমনি রিক্ত, শূন্য, ম্রিয়মান পড়ে থাকে—দূরে ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে থাকে ধাবমান বাষ্পরথের লাল স্মৃতিবিন্দুটুকু! ঠিক তেমনি ধাবমান কাল দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে মোড়ের পর মোড় ঘুরে, পথের পর পথ অতিক্রম করে, কখনো-বা পথ-পরিবর্তনের ঝংকার তুলে—শুধু আমরা তাকিয়ে আছি তার সেই প্রান্ততম স্মৃতিবিন্দুর মোহময় স্বপ্নটুকুর দিকে!

হঠাৎ-ই একসময় ছিঁড়ে গেল তন্দ্রার ঘোর। কখন ভোর হয়ে

গেছে। কোন্ এক বড়ো স্টেশনে এসে সত্যিই দাঁড়িয়েছে আমাদের গাড়ী। চোখ খুলতে প্রথমেই দৃষ্টি গেল বাঙ্কের উপর, কাজলের দিকে। সে এখনো তেমনি শুয়ে আছে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে। আমার ঘ্রানেন্দ্রিয়ে এসে লাগছে দামী সিগারেট ম্যাক্রোপোলোর গন্ধ, যতীনবাবু বাথরুম ঘুরে এসে এতক্ষণে সিগারেট ধরিয়েছেন নিশ্চয়। আর—

আর পাখীর নরম বুকের মতো পরশ দিয়ে কে যেন আমার মাথায় ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিচ্ছে হাতখানা। এতক্ষণে বেশ অনুভব করতে পারছি, রাত্রির শেষলগ্নে আর জেগে থাকতে না পেরে ঘুমে বোধহয় ঢলে পড়েছিলাম বেঞ্চির ওপরে, কে যেন সযত্নে তুলে নিয়েছে আমার ঘুমন্ত মাথাটা তার কোলে। মুখখানা দেখতেও হলো না, স্পর্শেই বুঝতে পারলাম, সুবালা।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। নিশীথ সেইভাবে তখনো ঘুমাচ্ছে অঘোরে। তার পাশে যে হোল্ডঅল্‌গুলি সাজিয়ে শুয়েছিল সুবালা, সেগুলি ততক্ষণে টেনে একটা কোণে জড়ো করা হয়েছে। উঠে বসেছে অঞ্জলি, উঠেছে আমাদের আরও অনেকে।—অন্য কামরা থেকে আমরা কে কেমন আছি দেখতে এসেছিল প্রণবেশ, আমি তার দিকে চোখ মেলতেই দেখি সে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে প্রখর দৃষ্টি মেলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাণীদি, কিন্তু সঞ্জয় ভিতরে আসেনি, খোলা দরজার সামনে প্লাটফর্মেই সে দাঁড়িয়ে আছে, আর আশ্চর্য, দৃষ্টি তার আমার দিকে, তারও দৃষ্টি কঠোর, তীব্র, তিরস্কার-মাখা!

অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বোধ করলাম মনেমনে। মনে হলো কী এক প্রচণ্ড অপরাধে আমি যেন অপরাধী, শুধু এদের কাছেই নয়, বিশ্বসংসারের কাছে। প্রণবেশ, সঞ্জয়, রাণীদি—এদের চোখের দৃষ্টি যেন মাত্র দৃষ্টিই নয়, বিদ্যুতের কশা! যে অদৃশ্য বিচারক সবার অন্তরালে বসে সবার সব-কিছুই বিচার করে যান, আমার বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য

দিয়ে এটুকু বুঝেছি, সে বিচারে বিন্দুতম ত্রুটি থাকে না, পরজন্ম নয়, এজন্মেই দণ্ডাঘাত গ্রহণ করে যেতে হবে সবাইকে। সেই বিশ্ব-বিচারকের অমোঘ বাণীই যেন ফুটে উঠেছে ওদের বিরক্তি আর কঠোরতার মধ্য দিয়ে! মানুষ দেয় এক, অপরে পায় অন্য-কিছু—এ-ও ঘটে। এরা কেন যে হঠাৎ বিরক্ত আর ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল আমার ওপর আমি জানি না, অথচ আমি যেন নির্ভুল পড়তে পারলাম সেই অদৃশ্য বিচার-কর্তার নির্দেশ। কিন্তু—

হ্যাঁ, এই কিন্তু নিয়েই সব। যে প্রণবেশ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সে নেমে গেল কামরা থেকে একটিও কথা না বলে, যে রাণীদি আমার কাছে মন খুলে তার সব গোপন কথাই বলে, সঞ্জয় প্রণবেশের সঙ্গে অন্যদিকে চলে যাবার পর সে ও বসে রইল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। যতীনবাবু নীরবে আবার একটি ম্যাক্রোপোলো ধরালেন, অঞ্জলি উদাসিনীর মতো জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল, আর কী পরম প্রশান্তিতেই না ঘুমোতে লাগল নিশীথ, নিঃশ্বাস নেওয়া ও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ওঠানামাতে এক মুহূর্তের জন্যও হলো না ছন্দ-পতন।

কিন্তু? এই কিন্তুর বিকৃত প্রশ্ন অচিরেই ফুটে উঠল প্রণবেশের কণ্ঠস্বরে, কলকাতায় ফিরে আসার ক'দিন পরে। আমাদের নাট্যায়তন ততদিনে নতুন রূপ নিয়ে 'নিওন লাইট'-এর আভায় নতুন নামে কলকাতার রাজপথের ধারে উদ্ভাসিত। মালিকদের ছুটোছুটির অন্ত নেই, আমাদেরও ব্যস্ততার শেষ নেই। ওরই মধ্যে রাণীদি একফাঁকে জনান্তিকে আমাকে বলে উঠল, ছিঃ! আপনিও এই রকম!

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম ওর দিকে, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অঞ্জলি বললে, প্রথম যেদিন এলেন, দেখেছিলাম, ফুলের মতো আপনার মন। কিন্তু এ কি! সেই ফুলে যে কীট প্রবেশ করেছে!

পাশ কাটিয়ে চলে গেল অঞ্জলি। ওর কথাও স্পষ্ট বুঝলাম না।

আমি। অবশেষে একদিন সকালে বুকিং-অফিস-এর ভিতর থেকে জোর করে বার করে আনলাম প্রণবেশকে। দর্শকদের সারি-সারি শূন্য আসনের একান্তে বসে মাথার ওপরের পাখাটা খুলে দিয়ে ওকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলাম, সেই ট্রেন থেকেই কথা বন্ধ করে দিয়েছ তুমি। কিন্তু কেন, কী করেছি আমি!

—কী করেছো!—মুখের জ্বলন্ত 'চারমিনার'-মার্কা কড়া সিগারেট্‌টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল, বলল, দলের সবাই যে কথা জানে, যে-কথা নিয়ে কানাকানি করছে, তা তুমি জানো না!

—কী?

প্রচণ্ড ক্রোধে সর্বশরীর যেন কাঁপছে প্রণবেশের, বললে, তুমি আমাদের সবার সম্মানীয়, কিন্তু কী করেছো সেদিন ট্রেনে! সুবালার মতো একটা যা তা মেয়ের কোলে মাথা রেখে তুমি ঘুমিয়েছ! এটাই কি তোমার কাছে আমাদের আশা!

বিপুল বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম প্রথমটা। তারপর 'হো-হো' করে হেসে উঠলাম সকৌতুকে, ওঃ হরি, এ-ই!

—হ্যাঁ, এই-ই!—প্রণবেশ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এই এইটুকুই যে আমাদের কাছে কতোখানি, তাকি তুমি দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করবে?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, তুমি কী বলতে চাও, প্রণবেশ?

উত্তেজিত ভঙ্গিমায় আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো প্রণবেশ, বললে, বলতে চাই, ও মেয়েটি তোমার কে? ঐ সুবালা? জানো ওর জঘন্য হিস্ট্রী?

দ্রুত বলে উঠলাম, সব জানি। ও আমার—

বাধা দিয়ে প্রণবেশ বলল, থাক। আর দয়া করে উচ্চারণ করো

না। তোমার চোখ, তোমার ভঙ্গী—সব বলে দেয় ও তোমার কে। তুমি কি বলতে চাও, আমবা কেউ বুঝতে পাবি না! অথচ তুমি ম্যারেড, তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা আছে—

—কিন্তু প্রণবেশ, আমি—

—থাক।—প্রণবেশ তেমনি উত্তেজিত ভঙ্গিমায় বলতে লাগল, তুমি কি বলবে আমি জানি! তুমি বলবে, বিয়ে আব প্রেম এক জিনিষ নয়। কিন্তু একটা প্রচলিত মেয়েলি কথা আছে জানো ত, কয়েক মুহূর্তেব আলাপেই আত্মাব আত্মীয়কে চিনতে পাবা যায? তোমাব সঙ্গে আমাব পবিচয বছব খানেকও নয, কিন্তু তোমাব-আমাব অন্তরঙ্গতাকে যদি ঐ ভাবে ব্যাখ্যা কবি, তাহলে কী খুবই ভুল কবা হবে? অন্ততঃ আমাব দিক থেকে হবে না। তাই তোমাব অবস্থা দেখে এক-এক রাত্রে ঘুমোতে পাবি না, ছটফট কবে মবি। আমাব কথা—

এবারে বাধা দিলাম আমি, বললাম, ঠোঁটেব কোণে হাসি টেনে এনেই বললাম, তুমি নিজেই নিজেব প্রশ্নেব উত্তব দিয়েছ প্রণবেশ। কয়েক মুহূর্তেব আলাপেই আত্মাব আত্মায়কে চিনতে পাবা যায়, ভুল হয় না।

আমার একটা হাত প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিলো প্রণবেশ, বললে, সেইখানেই ত আমাব ভয! তুমি যদি আব সবাব মতো হতে, এ ব্যাপাবে আমিই হাল্‌কা সুবে কথাবার্তা কইতাম সবাব আগে, সুবালাকে নিয়ে তোমাকে ঠাট্টাও কবতাম কিছুক্ষণ, তাবপরে বাড়ী গিয়ে সবকিছু যেতাম ভুলে।

—সেটাই ত ভালো হতো!

উত্তেজিত অথচ চাপা কণ্ঠস্বরে প্রণবেশ বললে, ভোগ চাও? আমি এ লাইনের পুবানো লোক, ভোগেব স্বর্গে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে! কোন্ পথ দিয়ে যে সে পথে যাওয়া যায়, তা আমার জানা! কিন্তু

তোমাকে ত চিনেছি,—তাই ভয় পাই, ঐ মেয়েটিকে যদি সত্যিই হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে শুরু করো ত, অঙ্গারের মতো জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যাবে!

এততেও হাসি এলো আমার ঠোঁটের কোণে, বললাম,—তাতেই বা ক্ষতি কী?

—ক্ষতি নয়!—প্রণবেশ আমার চোখের ওপর রাখলো তার চোখের পূর্ণ দৃষ্টি, বললে,—এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না, তুমি আমার ডিস্‌কভারী!

বলেই আর দাঁড়ালো না, দ্রুত চলে গেল রক্তাক্ষরে একজিট লেখা একটা দরজার দিকে।

সেদিন ট্রেনে আমি অদৃশ্য বিচারকের যে ভ্রূকুটি দেখেছিলাম ওদেরই মধ্য দিয়ে, তার সঙ্গে ওদের এই চিন্তা আর ভাবধারার মিল নেই একেবারেই।

ধপ করে বসে পড়লাম চেয়ারটায়। মস্তিষ্কের কোষে কোষে বার বার ঝিম্‌ঝিম্ করে বাজতে লাগল প্রণবেশের একটি কথা, তোমার চোখ, তোমার ভঙ্গী বলে দেয়—ও তোমার কে?

মাথার ওপরে পাখাটা সোঁ-সোঁ করে ঘুরছে! ঘূর্ণায়মান পাখাটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, হল-এ ঢুকে আমি প্রণবেশকে কিছু বলার আগেই পাখার সুইসটা টিপে দিয়েছিলাম কেন? প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যেও মানুষের মনের অন্তস্তলে বোধ হয় এমনি করেই এক ধীর-বুদ্ধির স্রোতধারা বইতে থাকে! বড়ো ভালো লাগছে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ওপরে এসে-লাগা পাখার হাওয়াটা। সমস্তটা অডিটোরিয়াম জুড়ে কেউ কোথাও নেই, সবগুলি পাখাই বন্ধ, শুধু একটি পাখাই দলছাড়া পাখীর মতো ডানা ঝটপট করে মরছে!

আবার একসময় দরজা ঠেলে ধীরে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো

প্রণবেশ, বললে, নর্থ বেঙ্গল টুরের পর আর ত কোনো কথা হয়নি,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। বাড়ীর খবর কী ? মিসেস কেমন আছে ?

—ভালো।

—ছেলেমেয়ে ?

—ভালো।

প্রণবেশ কিন্তু বসেনি। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে মুহুর্মুহু কয়েকটা টান দিয়ে তারপরে বললে, আরও একটা সীরিয়াস কথা তোমাকে বলার আছে।

—কী ?

আমার চেয়ারের হাতলের ওপরে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো প্রণবেশ, বললে, নাটকের একটা সিকোয়েন্স তোমাকে বদলাতে হবে।

—কোন্ নাটকের ?

—যে নাটক আমরা এখন প্লে করছি।

একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইলাম ওর দিকে, তারপরে বললাম, কিন্তু আমাকে বলছ কেন ? আমি বদলাবার কে ?

—তুমি বদলাবার কে, মানে ? তুমি নাট্যকার। নিশ্চয়ই বদলাতে পারো এবং বদলাতে হবেই।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপরে বললাম,—বেশ। কিন্তু কোন্ সিকোয়েন্স, শুনি ?

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পায়ের জুতোয় সেটা ভালো করে পিষে ফেলে প্রণবেশ বললে, ঐ যেখানে নিশীথ সুবালার খুব কাছে দাঁড়িয়ে তার দু'টি কাঁধে হাত রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে বলছে, আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না—যাবো না—আর তারপরেই আলো যাচ্ছে নিভে, মঞ্চ যাচ্ছে ঘুরে, আর বেহালায় বেজে উঠছে জয়জয়ন্তী-সুর !

—কিন্তু, নাটকের এতবড়ো একটা মুহূর্ত,—এটা বদলাবো কেন ?

আমার দুই চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করল প্রণবেশ, তারপরে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, নাটকের মুহূর্তই বটে !

—তার মানে !

প্রণবেশ বললে, ঠিক সেইভাবে চোখের ওপর চোখ রেখেই বললে, জয়জয়ন্তীর সুর যখন বাজে, মঞ্চ যখন অন্ধকারে ঘুরতে থাকে, তখন ওরা ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কী করে জানো ?

—কারা !

—ঐ সুবালা আর নিশীথ ?

রুদ্ধকণ্ঠে কোনক্রমে বলে উঠলাম, কী করে !

প্রণবেশ আমার দিকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ে বললে,—কী করে একদিন লক্ষ্য করে দেখো। সেক্সপীয়রের ভাষায়,—"Lips, two blushing pilgrims, ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss."

আমার কণ্ঠস্বর বোধ হয় কম্পিত আর্তস্বরের মতই শোনালো,—অ্যাঁ! কী বললে !

—হ্যাঁ। হ্যাট্‌স্ হোয়াট্ ইওর সুবালা ইজ্।

স্তব্ধ হয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। ভাবছিলাম কিন্তু অন্যকথা। ট্রেনে যা আমি দেখেছিলাম, তা তাহলে মুহূর্তের দুর্বলতা নয়, সম্পর্ক গেছে আরও গভীরে ? বললাম,—কবে থেকে এটা হয়েছে জানো ?

—কবে মানে ? অনেকদিন থেকেই। অনেকদিন আগেই রিপোর্ট পেয়েছিলাম, তবে এসব আমি গ্রাহ্যই করি না। কিন্তু এখন দেখছি স্টেপ না নিলেই নয়।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, নিশীথ এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—স্টেজে। তে-তলায়। হারমনিয়াম নিয়ে বসেছে।

বললাম, আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

—পারবে ?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, কেন পারব না !

—কী বলবে গিয়ে ?

—কী বলব ? একটু থেমে তারপরে বললাম, তুমি যেভাবে সোজা আমাকে এসে বললে, তেমনি সোজাসুজিই যদি ওকে বলি, সুবালা তোমার কে ?

ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি টেনে প্রণবেশ নিম্নকণ্ঠে বললে, দাউ জেলাস ক্রীচার !

—কী বললে !

হাতটা ধরে প্রণবেশ বললে, ভাই হে, পচা পাঁকে কখনই পদ্মফুল জন্মায় না, ওটা নিছক কবি-কল্পনা ! ডেড্ সয়েল। মরা মাটি। একেবারেই মরা।

—কিন্তু জলের ওপব ভাসতে দেখেছো পদ্ম ? একটা ডুব দিয়ে গোড়ায় হাত দিয়ে দেখো, পাঁকই উঠবে।

—ভুল !—প্রণবেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—সম্পূর্ণ ভুল ! সেক্ষেত্রে ভালো করে দেখো, পাঁকেরও নীচে নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও আছে নিষ্কলঙ্ক মাটি !

—ঠিক বলেছো—চেয়ার ছেড়ে দু-পা এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম।—পদ্ম যখন ফুটেছে, পাঁকের মধ্যে মাটি নিশ্চয়ই আছে ! সেই উজ্জ্বল মৃত্তিকা আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। দাঁড়াও, আসছি।

হন হন করে ওর পাশ কাটিয়ে চলে এলাম বাইরে। দ্রুত নেপথ্য-গৃহের দিকে যেতে যেতে অতিকায় বন্ধ পিয়ানোটার আড়াল থেকে

ম্যাক্রোপোলোর গন্ধ পেলাম, অর্থাৎ যতীনবাবু ওখানেই কোথাও বসে আছেন চুপ চাপ।

নিচের সিঁড়ির কাছেই আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল সঞ্জয় আর রাণী। সঞ্জয় বোধহয় বকে থাকবে রাণীকে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল রাণী। কিন্তু আমার তা' দেখবার অবকাশ ছিল না, আমি দ্রুত ওদের পাশ কাটিয়ে সরাসরি উঠে গেলাম তে-তলায়।

একটা ঘবের বন্ধ দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল সুবালা। হ্যাঁ, সুবালাই। ভিতর-থেকে-আসা অস্ফুট হারমনিয়ামের সুর আর দরজায়-দাঁড়ানো সুবালা,—সবটা মিলিয়ে মুহূর্তে ঘটালো আমার ধৈর্যচ্যুতি। আমাকে সিঁড়ির মুখে দেখামাত্র সুবালা এগিয়ে এঁলো আমার দিকে। কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে তাকে পাশ কাটিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলাম সেই ঘরটার কাছে। ধাক্কা দিয়ে সশব্দে খুলে ফেললাম দরজা।

খোলা হারমনিয়ামটার রীড্গুলির ওপবে মাথা নীচু করে পড়েছিল নিশীথ, দরজার শব্দে চম্‌কে উঠে বসল। বলল, দাদা, আপনি!

—হ্যাঁ।

অদ্ভুত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করলাম ওর কণ্ঠে, বললে, ঠিক সময়েই এসেছেন। আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আসুন দাদা, একটু বসুন।

—কেন?

উদারার কোমল নিখাদে আঙুল রেখে ধীরে ধীরে বেলো করতে লাগল হারমনিয়ামের। বললে, নিজের কাজ করছিলাম একটু।

সতরঞ্চির এক কোণে বসে পড়ে বললাম, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে নিশীথ।

—আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।—নিশীথ নিখাদ থেকে

এবার মুদারার কোমল গান্ধারে এলো, বললে, আপনারাই আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

—কী রকম!

হেসে বললে,—যা দিয়েছেন।

—কী দিয়েছি?

—বিদ্যা।

চমকে উঠলাম মনেমনে, ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, গান ত অনেক গেয়েছি। তুমি আকাশের চাঁদ, আমি রজনীগন্ধা-ফুল। তোমাব জ্যোৎস্নায় আমার সৌবভ মিশিয়ে দিচ্ছি। এসব ত বহু হয়েছে। কিন্তু ঐ পুরনো গান, যার কথা আপনি কিছুদিন আগে গল্প করলেন না? এই ধরুন, মধু কান, গোপাল উড়ে, নিধুবাবু। মধু কান পাইনি দাদা, উইয়ে-কাটা পুবনো গোপাল-বাবুর একখানা বই খুঁজে পেলাম বাবার আলমারীতে। সত্যি-সত্যি-সত্যি! কোথায় যেন অদ্ভুত প্রাণ আছে এই সব গানে।

যা বলতে এসেছিলাম, তা শুরু করার আগে হঠাৎই সুরের রাজ্যে ডুবে গেল নিশীথ। গাইতে-গাইতে বন্ধ করেছে দুটি চোখ। পুরনো রচনা, আজকের দিনের চোখ দিয়ে দেখলে হয়ত হাসিই আসবে, কিন্তু এমনভাবে গাইতে লাগল নিশীথ, যেন সত্যিই সে চলে গেছে এক ফুলের রাজ্যে এক মালিনীর কুঁড়ে ঘরের আঙিনায়। বলছে, মুগ্ধ হয়েছি বিদ্যার রূপ দেখে। মালিনী, তুমি আমার মাসী। বলে দাও, কেমন করে তাকে পাবো? মাসী বললে, বিদ্যা পাবার আশা থাকে, চাঁদমুখে ছাই মাখো। বসন ভূষণ ত্যজ্য করো,—নইলে পথ দেখ।

শুনতে শুনতে হঠাৎই স্বামী বিবেকানন্দের সেই কাহিনীটি মনে পড়ে গেল। তখনো তিনি 'স্বামিজী' হননি। অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে আছেন। কতো রাত কে জানে! ভিতরের উঠোনে উজ্জ্বল

আলোকমালা, উৎসব সমারোহ। যাত্রাগান চলেছে, বিদ্যাসুন্দরের পালা। ওঁর ভালো লাগেনি এই নাচ-গান আর ভীড়। একাকী এসে বসেছেন বাইরে। মনটা আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির। হঠাৎ ভিতরের আসর থেকে ভেসে-আসা একটি গানের কলি ওঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। বিদ্যা পাবার আশা থাকে, চাঁদমুখে ছাই মাখো। বসন-ভূষণ ত্যজ্য করো,—নইলে পথ দেখ। মুহূর্তে যেন আলোর রেখা দেখতে পেলেন অন্ধকারে। ব্রহ্মবিদ্যা যদি সত্যি লাভ করতে হযত, সর্বাঙ্গে ছাই মেখে আর বসন-ভূষণ ত্যজ্য করে সন্ন্যাসীই হতে হবে।

ততক্ষণে থেমে গেছে নিশীথ। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই বললে,—আরেকটা শুনুন।

বোধহয় না শুনলেই ভালো হতো আর। এবার মনে হলো, গান নয়। যেন বুকের ভিতরে কার শতদলের মতো রক্তাক্ত মর্মটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তবে আর ভালবাসিব না। আমি ভালবেসে পাই যন্ত্রণা। আমি যারে ভালবাসি, সে দেয় আমায় গলায় ফাঁসি। দূরে থেকে টানে রশি, এমন টানে প্রাণ বাঁচে না।

কিন্তু, কার মর্ম? নিশীথের, না আমার। মনে হলো সত্যি বুকের ভিতরটা ভেঙে যাচ্ছে! কিন্তু অদ্ভুত সুরের মোহ। আবার যখন ও ফিরে গাইতে লাগল গানখানা, তখন ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হয়ে গেল মন। গানের সুরে ডুব-দেওয়া-মন নিশীথকে আর কী আমি বলতে পারি?

এই-ই আমি। আমার ঈর্ষার এবং ক্রোধের বিদ্যুৎস্পর্শে ওকে সম্ভবত প্রবল নাড়া আর আঘাত দিতেই এসেছিলাম, কিন্তু মুহূর্তে ভরে গেল মন অদ্ভুত এক করুণায়, ডুবে গেল মন অদ্ভুত এক শিল্প-রসে।

বোধহয় এটাই হয়, নইলে বাঁচে কী করে মানুষ আঘাত সহ্য করে? প্রতিটি মানুষের অন্তরে একটি শিল্পীমন লুকানো আছে, রসপাগল ব্যক্তিত্ব

আছে, যে তাকে বাইরের সংঘাত থেকে বাঁচায়, ঝঙ্কার প্রবল প্রহার থেকে রক্ষা করে থাকে।

মনে হলো, ওরা যদি দু'জনকে দু'জনে ভালোবেসেই থাকে, তাতে আমার কী? সত্যিই ত, সুবালা আমার কে? দুটি চোখ বুজে করুণ ভৈরবীর সুরে টেনে টেনে আবার যখন ফিরে গাইছিল নিশীথ, ভালবেসে পাই যন্ত্রণা,—আমি চুপি চুপি তার কাছ থেকে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

ধীরে পায়ে নির্জন বারান্দাটা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম অন্যমনে, হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে আমার পাঞ্জাবীর প্রান্তে পড়ল টান। চমকে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকাব কোনটাতে দাঁড়িয়ে,—সুবালা। বললে,—আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

বললে,—সেই ট্রেন থেকে নেমে অবধি কোনো কথা বলছ না, এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ। কেন, কী করেছি আমি!

বললাম,—কিছুই করোনি।

সরে এলাম, তেমনি ধীর পায়ে নেমে এলাম নীচে।

সিফ্‌টাররা বোধ হয় সেট সাজিয়ে কী সব দেখছে, আলো জ্বলছে স্টেজে, আর, সেই আলোয় একটা আঁকা ডালপালার ঝাঁকড়া পলাশগাছ রক্তবর্ণের ফুলের গুচ্ছে গুচ্ছে টকটকে লাল হয়ে আছে।

—দাদা?

চমকে বলে উঠলাম,—কে?

-আমি দাদা, কাজল!

-কাজল!

দেয়াল ঘেঁষে যেখানে রঙ-করা কাঠগুলো পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তারই একপাশে দুটো ছোট ছোট চেয়ার। একটাতে বসে

কাজল, অপরটা খালি। চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে কাজল বললে, এখানে একটু বসবে ?

কোনো কথা না বলে সত্যিই গিয়ে ধীরে ধীরে বসলাম ওর পাশে। বললাম, আর সব কোথায় ?

—দোতলায়—অফিস ঘরের পাশের বড়ো ঘরটাতে। তোমাকে খুঁজছিল। প্রণবেশদা বললে, ও একটু কাজে গেছে, এখুনি আসবে।

স্টেজের আলোটা এই সময় দপ করে নিভে গেল। আমার হাতে ধীরে ধীরে এসে পড়ল কাজলের হাতখানা।

—কী রে ?

কান্নাভরা কণ্ঠে কাজল বললে, আমার সঙ্গে ও আর কথা বলবে না।

—কে ? সেই যে যার কথা বলেছিলি ? শঙ্কর ?

—হ্যাঁ আমাকে এইমাত্র পৌঁছে দিয়ে গেল। কী বলছে জানো ? বলছে কাজ ছেড়ে দাও।

—কেন ?

—এসব কাজ ও পছন্দ করে না, বলে, এসব যায়গার আবহাওয়া নাকি খারাপ !

একটু হেসেই উঠলাম, বললাম, পাগল একেবারে !

স্টেজের আলো আবার জ্বলে উঠল, সেটটা সরাচ্ছে সিফ্‌টাররা, তারই শব্দ। পরমুহূর্তেই দেখি, সুবালা রীতিমত পায়ের শব্দ করেই আমাদের পাশ দিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

তেমনিভাবে আমার হাতে হাত বুলাতে বুলাতেই কাজল বলে উঠল—দাদা, তোমাকে খুব ভালবাসে, না ?

—কে ?

—ঐ সুবালা ?

একটু হেসে উঠলাম, বললাম, না-না, তা' কেন ?

একটু থেমে তারপরে বললে,—ট্রেনে শুয়ে শুয়ে আমি সব দেখেছি।

—কী!

বড়োবোন যেমন করে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বিপুল স্নেহে হেসেহেসে কথা বলে, তেমনি করে বলতে লাগল, সারারাত জেগে থেকে শেষ রাত্তিরের দিকে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। জানালায় গরাদের কাছে কেমন ভাবেই না লুটোচ্ছিল তোমার মাথা। দেখি, সুবালা উঠে বসে তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে। তারপরে একসময় জিনিস-পত্র টপ্‌কে ও তোমার কাছে গেল, পাশে বসে কোলের ওপর টেনে নিলো তোমার মাথাটা। তুমি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছ!

—তা হবে। আমি কিছুই টের পাইনি!

একটু থেমে আবার বললে, দাদা?

—কী?

—যতীনদা-প্রণবেশদা, ওরা সব কী বলাবলি করছিল জানো?

মনেমনে একটু শঙ্কিতই হয়ে উঠলাম, বললাম, কী।

—যাচ্ছে-তাই সব কথা। নিশীথ আর সুবালা।

—কী সব কথা!

মুখ টিপেটিপে হাসতে লাগল কাজল। একটু উত্তেজনাই বোধ হয় ফুটে উঠল আমার কণ্ঠস্বরে, বললাম,—কিন্তু, কী হয়েছেরে তাতে? যখন অভিনয় করতে হয় স্টেজে, তখন হাত ধরাধরি করতে হয় না? একের কোলে অপরের মাথা রেখে শুতে হয় না? তোদের আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি!

কাজল বললে, তা তুমি যা-ই বলো, বাহাদুর মেয়ে বটে! তোমাকেও ভালবাসছে, আবার নিশীথের ওপরেও টান আছে প্রচুর।

বললাম, তা-ই যদি বলিস ত, নিশীথ সুপুরুষ, তাকে ভালবাসার একটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমাকে বাসবে কেন তা বলে? ওসব তোদের কল্পনা!

কী জানি কেন, মুখে আঁচল চেপে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগল কাজল। আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম ওর কাছ থেকে।

সবার সঙ্গেই দেখা হলো অফিসঘরে। কিন্তু সুবালা নেই। কে যেন বললে, ভীষণ মাথা ধরেছে ওর, তাই বাড়ী চলে গেছে ছুটি নিয়ে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আমারও কাজ হয়ে গেল, আমি গেটের বাইরে এসে কী জানি কেন বন্ধুবান্ধবদের বাসায় কোথাও না গিয়ে সোজা চলে এলাম বাড়ী। কিন্তু বাড়ীতে যে আমার জন্য এতোবড় একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা অপেক্ষা করছিল, তা কি আমি জানতাম?

*

আরতির বোধ হয় আর তর সইছিল না, আমার সাড়া পেয়ে নিজেই একেবারে ছুটে এসে খুলে দিলো সদর-দরজার খিল, চাপা উত্তেজনায় ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল, কে এসেছে, শীগ্‌গির দেখ এসে।

ওর এই আগ্রহের আতিশয্য দেখে বিস্মিতই হলাম, বললাম,—কে?

রুনুর মা হয়ে গেছে যেন একেবারে আট বছরের রুণু, বললে, সেই যে 'রথযাত্রা' পত্রিকায় যার ছবি বেরোয়, সেই মেয়েটি।

'মেয়ে' শব্দটি শোনামাত্রই দুরুদুরু করে উঠল বুকের ভিতরটা, রুদ্ধ-কণ্ঠে কোন ক্রমে প্রশ্ন করলাম, কে মেয়েটি?

যা সন্দেহ করেছিলাম, তা-ই হলো। আরতি বললে, সুবালা ঘোষ।

রুণু আর ঝুনুকে দুপাশে নিয়ে খাটের ওপরে পাখার নীচে বসেছিল সুবালা, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে দুটি হাত জোড় করে বললে, নমস্কার!

যন্ত্রচালিতের মতো আমার হাত দুটি বুকের কাছ পর্যন্ত নমস্কারের ভঙ্গীতে উঠে আবার নেমে গেল।

তেমনি সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ সুবালার, বললে, আপনার নতুন

নাটকে কাজ করব ত, তাই ভাবলাম নাট্যকারের সঙ্গে একেবারে চাক্ষুষ আলাপই করে আসি সবার আগে।

—নতুন নাটক!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সুবালা বললে,—ঐ যে চারদিনের রিহার্স্যালে যে নাটক আপনারা নামিয়েছেন থিয়েটারে।

আট বছরের কন্যা রুণু যেমন করে এসে হন্তদন্ত হয়ে সংবাদ দেয়,—জানো বাবা, ও বাড়ীর বেলাদির পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে হবে কাল—সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে!—ঠিক তেমনি সুরেই রুণুর মা আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠল,—হ্যাঁ গো, সত্যি নাকি! চারদিনের রিহার্স্যালে তোমাদের নাটক নেমেছে! তাই টুর থেকে ফিরে আসার পর ক'দিন একেবারে নাইবার-খাবারও সময় ছিল না!

রুণু নয়, আমার তিনবছরের পুত্র ঝুণু ততক্ষণে সুবালার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ে-পায়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ভাব দেখে মনে হলো, তিনটি স্ত্রীলোকের সাহচর্যে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল সে, এতক্ষণে একটি 'স্বজাতি' পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল!

—তা ঐ নতুন নাটকে যে মেয়েটি নায়িকা সাজছে সে ত রাগ করে কাজ ছেড়ে দিয়েছে,—সুবালা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সমর্থন খুঁজছে তার এই মিথ্যাভাষণের, বললে,—আমি তার যায়গায় কাজ করব ত? তাই এলাম, চরিত্রটা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমার বিস্ময়ের ঘোর যে তখনো ঠিক কাটেনি, আমার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছে সুবালা, তাই আমাকে কোনো উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই তাড়াতাড়ি বলে উঠল রুণুর মার মুখের দিকে তাকিয়ে, জানো আরতিদি, ওটা আমারই করার কথা ছিল, বিজ্ঞাপনে প্রথম থেকেই সেজন্য দিচ্ছিল আমার নাম। তুমি দেখনি?

অপ্রতিভের মতো উত্তর দিলো আরতি, হ্যাঁ, তা দেখেছি বই কী! কী গো, দেখিনি?

এতক্ষণে হেসে উঠলাম আমি। বললাম, তা দেখা ত উচিত। কাগজ-টাগজগুলো ত রোজই পড়ো মন দিয়ে।

তীরস্কারে গভীর হয়ে উঠল আরতির চোখের তারা, বললে,—বারে, কাগজ বুঝি পড়তে পারি না পাশের বাড়ী থেকে আনিয়ে?

বলেই চাঞ্চল্য আনল ভঙ্গীতে, বললো, বসো তোমরা, আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসছি। সারাদিন খেটেখুটে এসেছে, এক কাপ চা না দিলে চলবে কেন? তোমার জন্যও আর এক কাপ নিয়ে আসি সুবালা?

—না—না!—সুবালা বলে উঠল।—কতো কী খাওয়ালে এতক্ষণ বসে, আর চা নয়,—ওরে বাবা!

আরতি হেসে বললে, আচ্ছা, ঠিক আছে। রুণু আয়।

মায়ে-ঝিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। ওর চোখের তারা দুটি চাপা হাসির বিদ্যুতিতে ঝলোমল করছে। বললে,—বারে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

খাটের কাছেই বই-খাতা-পত্র-সাজানো টেবিল। তার সামনের চেয়ারটা ওর মুখোমুখি টেনে নিয়ে বসে পড়ে হেসে বললাম, কার ঘরে কে কাকে বসতে বলছে, তাই দেখছি! কিন্তু এসব কী ব্যাপার?

চোখের ইঙ্গিতে ঝুনুর উপস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েই সুবালা উত্তর দিলো, ব্যাপার আবার কী, এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।

তারপরেই কণ্ঠস্বর নিচুতে নামিয়ে বলে উঠল, কোনদিন ত আর বাড়ীতে আসতে বলা হয়নি!

এগিয়ে এসে ঝুনুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে খাটের ওপর আবার বসে পড়েছে সুবালা, বলল,—কী সুন্দর ছোট্ট ঘরখানা! মাথার ওপরে ঐ যে বাচ্চা পাখাটা বন্‌বন্ করে ঘুরছে, ওটাও ভালো।

—বড্ড মশা বলে তেমন গরম না থাকলেও ওটা সবসময় ঘোরাতে হয়। রেগুলেটর আছে, আরও স্পীড দিলে মনে হবে যেন প্রচণ্ড ঝড় বইছে!

মুচকি একটু হেসে বললে, না, ঝড়ের সম্ভাবনা নেই। ওটা মনের ভ্রম।

একটু থেমে, ধীর কণ্ঠে বললাম, সম্ভাবনার কথা কেউ বলতে পারে না।

মুহূর্তে প্রসঙ্গ পরিবর্তন কবল সুবালা। বললে, আর যাই হোক, বউ-ভাগ্য খুব ভালো। চমৎকার মেয়ে। আমি দিদি পাতিয়ে নিয়েছি।

গম্ভীর হয়ে গেল আমার মুখের ভাব। বললাম, এসব না হওয়াই ভালো।

—কেন?

বললাম, নিজেই বুঝে দেখ। ভুল-বোঝাবুঝির সূত্রপাত হতে পারে ত? তুমিই বলো?

কোনো উত্তর দিলো না সুবালা। ঝুনুকে বুকেব কাছে দু'হাতে চেপে ধরে কথা বলছিল, মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখি, দুটি চোখই ছল্‌ছল্‌ করে উঠেছে ওর।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে পার করে দিয়ে তারপর বলে উঠলাম প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করা কণ্ঠস্বরে, এখুনি আসবে আমার চা নিয়ে। চোখ দুটো মুছে ফেলো।

মুহূর্তে আবার সচেতন হয়ে উঠল সুবালা। তাড়াতাড়ি আঁচলে মুখ মুছে ঝুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চকোলেটগুলো কোথায় রেখেছ বাবা?

উঠে দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের দু' পকেটে দুটি হাত ঢুকিয়ে বলে উঠল ঝুনু,—এখানে!

—দু-একটা আর খাবে না?

—খেয়েছি। আর-ছব ছকালে খাবো। আমি খাবো—দিদি খাবে।

ওকে বুকের কাছে আবার টেনে নিলো সুবালা, গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎই একসময় আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো, বললে, এমন চুপচাপ যে?

তেমনি ফিস্‌ফিস্ করা সুরেই বললাম, এমন করে আমার বাড়ী আসা হলো কেন? আর এই অলি-গলির মধ্যে বাড়ীটা সহজে চিনেই বা বার করা হলো কেমন করে, তাই ভাবছি।

কণ্ঠে জোর এনে সহজ ভঙ্গিতে এতক্ষণে বলে উঠল সুবালা, বারে আমি এক্ষুণি উঠব, আমাকে চরিত্রটি বুঝিয়ে দিলেন না?

সোজা, শক্ত হয়ে উঠে বসলাম চেয়ারে। ততক্ষণে চা আর হালুয়া নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে রুণু আর রুণুর মা। চা-টা টেনে নিয়ে হালুয়ার প্লেটটা উঠিয়ে দিলাম মেয়ের হাতে, বললাম, তোমরা দু' ভাই-বোনে খাও গিয়ে।

—ওদের দিতে হবে না—ওরা খেয়েছে। আরতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তুমি খাবে না?

সংক্ষেপে বললাম, আমি খেয়ে এসেছি।

এক মুহূর্ত সব চুপচাপ। রুণু এগিয়ে এসে ঝুনুকে টেনে খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরের কোণের দিকে বসতে যাচ্ছিল, মায়ের ইঙ্গিতে চলে গেল বাইরের বারান্দায়। সেখানে দপ্ করে জ্বলে উঠল আবার লাইটটা।

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, কী বলছিলেন আপনি, চরিত্র, না? নায়িকা এক গায়কের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু গায়কের মধ্যে দিল দুটি সত্ত্বা। একটি ভিতরের শিল্পীমন, আরেকটি বাইরের মানুষ, সে উচ্ছৃঙ্খল—সে দেহবাদী। এরকম হয় ত?

সুবালা উত্তর দিলো না।

কণ্ঠস্বরে আরও জোর এনে বললাম, হয়। কিন্তু নায়িকার মনে

এমন একটা সহজাত শুচিতাবোধ ছিল তার দেহ-সম্বন্ধে যে, গায়কটির উচ্ছৃঙ্খলতা সে সহ্য করতে পারত না। তাই সে—

বাধা দিয়ে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো সুবালা, বললে, থাক। যেটুকু বুঝেছি, তাতেই আমার চলবে। আপনার কথায় বাধা দিলাম বলে দুঃখিত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এবার আমায় উঠতে হবে। রাত প্রায় আটটা বাজে। আমার স্বামী আজ ফিরবেন কিনা, নইলে অনেকক্ষণ গল্প করা যেতো।

আরতি এসে সস্নেহে ধরল ওর একখানা হাত। বলল, তোমার স্বামী বাইরে থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ। ঘোরার চাকরি। অনবরত টুর করতে হয়। আজ সাড়ে আটটা নাগাদ হাওড়ায় ওর গাড়ী 'ইন্' করবে।

আরতি বললে, এখুনি যাবে বুঝি?

—হ্যাঁ, দিদি। বড়ো আনন্দ পেলাম তোমার সঙ্গে মিশে। আমার কথা মনে রেখো।

উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, চলুন, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

সহজভাবেই বলে উঠল সুবালা, চলুন।

গলিপথের একের পর এক গ্যাসের আলো পার হয়ে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এলাম পাশাপাশি হেঁটে সম্পূর্ণ নীরবে! তারপরে, অকস্মাৎ নিজেই হাত দেখিয়ে একটা চলতি ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে বসলো সুবালা, বলল, এসো।

রাজপথের বহু দৃষ্টির কৌতূহলকে আর বাড়তে না দিয়ে বিনা প্রতিবাদেই বসলাম গিয়ে ট্যাক্সীর ভিতরে। বুড়ো শিখ-ড্রাইভারটাকে নিজেই নির্দেশ দিলো সুবালা। বলল, চলো গঙ্গার ধার।

কিছুক্ষণ ট্যাক্সী চলার পর একটা বাঁক নিতেই আমার দিকে মুখ ফেরালো স্থবালা। বলল,—কী করেছি আমি বলো ত ?

—কী আবার করবে ? কিছুই করোনি।

চট্ করে আমার হাতখানা নিল হাতে !

বললাম, তোমার স্বামী না আসছে ট্রেনে ? হাওড়া-স্টেশনে ?

মুখ টিপে একটু হাসল। বলল, কার স্বামী ? আমার ?

—হ্যাঁ !

কী অদ্ভুত ওর চোখের সেই গভীর দৃষ্টি, আমার চোখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে শেষে বলল, আমার স্বামী ? কে ?

তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলাম আমার হাত, সরে বসলাম সীটের এক-পাশে। বললাম, অর্থ হয় না। কোনো অর্থ হয় না এ ভাবালুতার !

আবার একটা মোড়। সবুজ আলোটা মিলিয়ে গিয়ে দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে টক্‌টকে লাল আলো। থেমে আছে ট্যাক্সীটা। কী-এক নিগূঢ় বেদনায় যেন ভরে গেছে ওর কণ্ঠ। বললে, তুমি আমার সম্বন্ধে কী ভেবেছো, আমি জানি। নিশীথের সঙ্গে—

—থাক ! বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, ওসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।

ট্যাক্সীটা পরমুহূর্তে আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওর কণ্ঠস্বর উঠে গেল উচ্চগ্রামে। চাপা একটা ক্ষোভ-মিশ্রিত কণ্ঠস্বরেই স্থবালা বললে, কী ভাবো তুমি আমায় ! যা তা নীচ একটা মেয়ে, না ?

—না কিছুই ভাবি না।

চুপ করে রইল ও।

বাইরের একটা জোরালো আলো এই সময় ওর মুখখানার ওপরে একটু পড়েই আবার সরে গেল।

কোথায় কার কাছে যেন একটা কথা শুনেছিলাম—পৃথিবীতে সবার থেকে আশ্চর্য বস্তু যদি কিছু থাকে, ত, সে হচ্ছে মানুষের মন। ওর দিকে

তাকাতে তাকাতে হঠাৎ-ই অদ্ভুত স্নেহ আর করুণায় ভরে গেল আমার মন। ট্রেনে সেই ওর নিশীথের বক্ষলগ্ন হওয়া কিম্বা প্রণবেশের মুখে শোনা মঞ্চ ঘুবে যাবার প্রাক্কালে ওর আর নিশীথের সেই নিবিড় অন্তরঙ্গতা—তখনো আমার বুকের মধ্যে বহ্নির মতো শিখায়িত। তবু তারই মধ্যে, ওর এই হঠাৎ আমাকে এভাবে ট্যাক্সীর ভিতরে আহ্বান করা, এও ভিতরে ভিতরে যে এক সূক্ষ্ম আনন্দ-রসের বৈচিত্র্য পরিবেশন করছিল, সে কথা অস্বীকার করব কেমন করে ?

এযে সেই 'প্রজ্বলিত ইক্ষুদণ্ড ইব' ! আখের খণ্ডটাকে দাউ দাউ কবে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে তার মধুব রসটাকে পান কবা।—আগুনে মুখ-মণ্ডল পুড়ে যাচ্ছে, তার যন্ত্রণাও সহ্যের অতীত,—আবার সঙ্গে সঙ্গে আখেব রসটাও ভিতরে যাচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা—বিচিত্র এক স্নিগ্ধতার স্পর্শ।

কী প্রশ্রয় ও দেখলো আমার চোখে কে জানে, গঙ্গার ধার দিয়ে ট্যাক্সীটা যখন মন্থরগতিতে পবিক্রমা কবছিল, হঠাৎ ও শুয়ে পড়ল আমার কোলে মাথা রেখে।

—একী !

পাছুটো গুটিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ও তখন শুয়েছে, আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ছুটি চোখ বুজে ফেললে, অদ্ভুৎ এক পরিতৃপ্তির আভাষ ওর মুখে, বললে,—আঃ !

—ওঠো ? কী ভাববে পথের লোকজন !

আবেশজড়িত ছুটি চোখ মেলে বললে, লোক কই পথে ?

—কী মনে করছে ড্রাইভারটা !

একবার মাথাটা উঁচু করে তুলে তাকালো বুড়ো ড্রাইভারটির দিকে, নির্বিকার এক যন্ত্রের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে বৃদ্ধ শিখ-সর্দার, অন্য কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই, শুধু গতিবেগ সে অবিশ্বাস্য-রকম কমিয়ে দিয়েছে গাড়ীর।

মুখখানা ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো সুবালা, বললে, বড়ো ক্লান্তি লাগে এক একসময়, জানো ?

—ক্লান্তি !

বড়ো বিষণ্ণ ওর দৃষ্টি, বড়ো করুণ ওর কণ্ঠস্বর, বললে, হ্যাঁ। এক একসময় মনে হয়,—আর বোধহয় পারব না জীবনের এই বোঝা টেনে নিয়ে বেড়াতে ! এই দেখ না, ঘুম পাচ্ছে ভীষণ !

—ঘুম !

—ঘুম। ও বললে, এই যে তোমার সঙ্গ পেয়েছি এতটুকু, মনে হচ্ছে, অবসান হয়ে গেছে আমার সমস্ত চিন্তার—সমস্ত সমস্যার !

ওর কথা শুনতে শুনতে নিবিড় মমতায় ভরে গেল আমার মন। ধীরে ধীরে ওর মাথায়-কপালে-গালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বিশ্বসংসারের সমস্ত ছবি যেন সেই মুহূর্তে মুছে গেছে আমার সামনে থেকে ! শুধু একখানা মুখ ! অজস্র কুয়াশার রাশি ভেদ করে উজ্জ্বল-হয়ে-ভেসে-ওঠা একখানা মুখ !

ও-ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে সেই মুহূর্তে। আমার চোখের দিকে বিস্মিত, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী দেখতে পেয়েছিল কে জানে ! হঠাৎ-ই আমার হাতখানা টেনে নিলো হাতের মধ্যে, বলল, এতো ভালবাসা ! এতো ভালবাসা তোমার মধ্যে !

আর আশ্চর্য, বলতে বলতে ওর দুচোখ ভরে উঠল জলে।

খোঁপা-ভেঙে-পড়া কেশরাশির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলাম, অমন করে না। ড্রাইভারটা সেই থেকে কী ভাবছে বলো ত ? ওঠো। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখ, কতো সব অদ্ভুৎ-অদ্ভুৎ নামের জাহাজ নোঙর ফেলে আছে !

ধীরে ধীরে উঠে বসল সুবালা, সীটের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে তারপরে যেন ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

একটু হেসে বললাম, দেখ কী অদ্ভুৎ ওই জাহাজটার নাম। "সিলভার ওক্"। সিলভার ওক্ গাছ দেখেছ? সেই গাছের নামে নাম হয়েছে জাহাজটার। জাহাজটা বিলাতী।

—কী করে বুঝলে?

—জাহাজের পিছনের ফ্ল্যাগ-টা দেখে।

—আচ্ছা? সুবালা তার মাথার খোঁপাটা ঠিক করতে করতে বললে, এই সব জাহাজে তুমি খুব ঘুরেছো, না?

চুপ করে রইলাম।

আবার প্রশ্ন হলো—জাহাজে-জাহাজে, সমুদ্রে-সমুদ্রে তোমার খুব একা একা লাগত, না?

এবারেও দিলাম না উত্তর।

নিজের মনেই বলে যেতে লাগল সুবালা, কী করতে হতো তোমাকে জাহাজে?

উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। ট্যাক্সী তখন স্ট্র্যাণ্ডের এলাকা ছেড়ে ডালহাউসী-র মধ্যে ঢুকে পড়েছে। রাত্রের নির্জন ডালহাউসী।

তখনো প্রশ্নের তরঙ্গ চলেছে, কতো টাকা ওরা মাইনে দিতো?

ট্যাক্সী তখন মোড় ফিরে আমারই নির্দেশে উত্তরাভিমুখে চলেছে। সুবালার প্রশ্নের তখনও শেষ নেই—তা হঠাৎ জাহাজে তুমি কাজ নিতে গেলে কেন?

বলে উঠলাম, বক্বকানি থামাও। আমি এখানে নেমে যাচ্ছি। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ী চলে যাও। দেখ গিয়ে এতক্ষণে মিস্টার ঘোষ হয়ত এসে গেছেন!

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে চাপা ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গেই বললে, মিস্টার ঘোষ —মিস্টার ঘোষ! দেখেছ তুমি মিস্টার ঘোষকে?

—না।

—তবে? সে লোকটাকে নিয়ে তোমার অতো মাথাব্যথা কেন?

হেসে ফেললাম।—একেবারে মাথাব্যথা নেই সে লোকটাকে নিয়ে। তুমি তাকে নিয়ে সুখে আছো, এটুকু জানতে পারলেই আমি সুখী।

—ওঃ বাবাগো!—যেন আর্তনাদ করে উঠল সুবালা, কান্নাভরা কণ্ঠে বলে উঠল, কথায় কথায় আমাকে চাবুক না মারলে তোমার চলে না, না?

—এই ট্যাক্সী, হিঁয়া রোখকে!

আমার জামার প্রান্তে সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল টান, ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল সুবালা, না—না, একী!

বললাম, এখানে নেমে যাই? আমায় বাড়ী ফিরতে হবে না?

—তেমন রাত হয়নি। আমাকে একেবারে বাড়ী পোঁছে দিয়ে আসবে চলো!

—দূর পাগল! তোমার বাড়ীর লোকেরা যদি কেউ দেখে ফেলে, ভাববেন কী তাঁরা?

—বারে!—সুবালা আশ্চর্য হয়ে বললে, এর মধ্যে আবার ভাবা-ভাবির কী আছে! এই ট্যাক্সী, চলো।

ট্যাক্সী আবার চলতে আরম্ভ করল। বললাম, কাজটা কিন্তু ভালো করলে না।

কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে উঠল, বেশ করেছি।

শোভাবাজারের কাছাকাছি চারিদিকের নতুন ঢংয়ের বাড়ীর মধ্যে একটা পুরানো ঢংয়ের বাড়ী। থামওয়ালা, লাল রং করা। বললে, এরই দোতলার দুটো ঘর নিয়ে আমরা থাকি।

বুড়ো শিখ ড্রাইভারটা ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখে যখন ভাড়াটা

নিচ্ছিল, তখন অদ্ভুত লাগছিল লোকটিকে। মানুষের এত বেশী সে দেখেছে যে দেখে-দেখে তার মুখখানা পাথর হয়ে গেছে যেন, মানুষকে নতুন করে দেখার কৌতূহল তার চোখে-মুখে আর ভাব-সঞ্চার করে না।

হুস্ করে ট্যাক্সীটা বেরিয়ে যেতেই বলে উঠলাম, এবার যাই?

—না-না, সে কী! সুবালা তাড়াতাড়ি বললে, ভিতরে আসবে না?

—না।

—'না' নয়, এসো। কখনো আসোনি, দেখ এসে কেমন আছি!

—কিন্তু, কী মনে করবেন মিস্টার ঘোষ!

দুটি চোখ তিরস্কারে গভীর হয়ে উঠল সুবালার, রাস্তায় সিন্ ক্রিয়েট করো না। ভিতরে এসো, উনি কিছু মনে করবেন না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিতরে যেতে হলো। বাড়ীর পাশ দিয়ে অন্ধকার একটা সরু গলি, সেটা পার হয়ে ভিজে স্যাঁতসেতে ইঁট-বার-করা সিঁড়ি। তার উপরে এসে পড়েছে ধোঁয়া-লেগে-কালো হয়ে যাওয়া ইলেক্‌ট্রিক বালবের পাণ্ডুর আলো। যেতে যেতে বলছিল, ভাড়াটেতে—ভাড়াটেতে বাড়ীটা একেবারে পায়রার খোপ। আমাদের ফ্ল্যাটটা একেবারে দোতলার একটেরে, পার্টিশন করা। কী, দাঁড়িয়ে পড়লে যে?

সিঁড়িটা মধ্যপথে যেখানে ঘুরে গেছে, সেই প্রায়ান্ধকার স্থানটুকুতে দাঁড়িয়ে আমার হাতে সন্তর্পণে একটু চাপ দিয়ে চুপি চুপি বললে, তোমার বাড়ী গেলুম, অন্ততঃ তার বদল হিসাবেও আমার বাসায় আসতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়!

—দ্বিধা করছে কে? আমার ভয়, তোমার শান্ত ঘরের মধ্যে পা ফেললে যেন ঝড়ের সৃষ্টি না করি!

অল্প একটু হেসে ওরই মধ্যে বলে ফেললে, তুমি সৃষ্টি করবে ঝড়! তাহলেই হয়েছে!

বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়া দিতেই আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে

এসে খিলটা খুলে দিলো। তাকে দেখিয়ে সুবালা বললে, আমার ননদ, আই-এ পড়ে।

তারপরেই তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, পড়ছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ বৌদি।

আমি কে বা কেন এসেছি, সে-সব জানবার কৌতূহল যেন মেয়েটির আদৌ নেই। সুবালা আমার দিকে ফিরে বললে, সামনে ওর অ্যানুএল পরীক্ষা কিনা, তাই এত পড়ার চাপ। তোমার দাদা এসেছে, মঞ্জু?

—না।

আবার আমার দিকে তাকালো।—দেখলেন ত, বাবুর বাড়ী-ফেরার নামগন্ধও নেই! মা কোথায় মঞ্জু? ঠাকুরঘরে?

—না।

—না? কোথায় তবে?

—ছোড়দাকে নিয়ে বরানগর গেছে পাঠবাড়ীতে।

—অ্যাঁ! বাড়ীতে তুমি একা?

—হ্যাঁ, বৌদি। বামুনদি ছিল, রান্নাবান্না শেষ করে এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে!—বলে মেয়েটি আর দাঁড়ালো না, চলে গেল নিজের ঘরে। পাশের ঘরটায় ঢুকে জোরালো আলোর সুইচ্ টিপে জ্বেলে দিয়ে টেবিলের সামনের চেয়ারটা একটু টেনে দিয়ে সুবালা বললে, বসুন। আমি এখ্খুনি আসছি।

নিম্নকণ্ঠে বললাম, বাড়ীতে বলতে গেলে কেউ নেই। আমার আসাটা কি ঠিক হলো?

ফিস্ফিস্-করা সুরেই বলে উঠল, দূর পাগল! কাজের সূত্রে কতো লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে! তুমিও তাদের মধ্যে কেউ-একজন বলে নিজেকে ধরে নাও না! একটা অসুবিধা হলো, বাসায় রাঁধুনী নেই, দেওরটিও নেই, তোমার খাতির-যত্ন করতে পারব না।

চেয়ারটা টেনে বসে পড়েছি ততক্ষণে। ওর কথায় অল্প একটু হেসে চুপ করে রইলাম।

—বসুন, আসছি।

চলে গেল ঘর ছেড়ে। বেশ সাজানো-গোছানো ঘরখানা। একপাশে একটা খাটের ওপরে নীল বেড্‌কভারটা টান-টান করে পাতা, ঝালর-দেওয়া ধব্‌ধবে চারটে মাথার বালিশই পর-পর এক সারিতে উঁচু করে সাজানো, পাশবালিশটা এক কোণে পড়ে আছে অনাদৃত হয়ে।

পরমুহূর্তে, একটা আলমারীর দিকে আমার দৃষ্টি হলো নিবদ্ধ। আলমারীটা ছোট্ট, আগাগোড়া কাঁচের, এমনকি আল্‌নাগুলিও কাঁচের, শুধু দুই কাঁচের যেখানে সংযোগস্থল, সেইখানটা নক্সা-করা কাঠ দিয়ে বাঁধানো। সেই কাঁচেব ঘরগুলিতে ছোট্ট-ছোট্ট পুতুল সাজানো, কোনো বউ মাছ কুট্‌ছে বঁটিতে, কোনো বউ মশলা বাট্‌ছে শিল নোড়ায়, কোনো বউ ঘোম্‌টা বেশী করে টেনে ঘরের দাওয়ায় এসেছে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে। গৃহস্থালীর দৈনন্দিন জীবনে একটি গৃহবধূর যে-যে ভূমিকা বিদ্যমান, তারই পরিচিতি বহন করে মূর্তিগুলি সমস্ত কাঁচের ঘরেই বিরাজ করছে। কাঁচের ঘরে পুতুলবধূব কার্যকলাপ কতক্ষণ ধ্যানমগ্নের মতো দেখছিলাম মনে নেই, চমক ভাঙল সুবালারই কণ্ঠস্বরে, কী দেখছেন অমন নিবিষ্ট চিত্তে?

মুখের দিকে তাকালাম ওর। লাল পাড় সাদা একটা শাড়ী ঘরোয়া-ভাবে পরে শ্বেত-পাথরের একটা গেলাসে নিয়ে এসেছে সরবৎ, বললে, আর কিছু খাওয়াতে পারলাম না, সরবৎটুকুই খান। চা করতে পারতাম, কিন্তু না, অতো চা খেয়ে আর কাজ নেই! নিন।

আমার হাতে গেলাসটি তুলে দিয়ে আরেকটি চেয়ার টেনে কাছেই বসল, বললে, ননদ জিজ্ঞাসা করছে, কে এই ভদ্রলোক? বললাম, নাটক-লিখিয়ে। আলাপ ছিল। পনেরো বছর পরে হঠাৎ দেখা, তাই ডেকে নিয়ে এলুম গল্প করব বলে।

—এদিকে কিন্তু রাত সাড়ে ন'টা।

—দূর, সাড়ে-নটা আবার রাত্তির নাকি ?

সরবৎটা শেষ করে গেলাসটা ঠক্ করে রাখবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, চাপা অথচ কোমল কণ্ঠে,—এই প্রথম এলে, কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। আচ্ছা, কথাটা কিন্তু বেশ বলে এসেছি ননদকে, তাই না ? পনেরো বছর পরে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়া ?

আশ্চর্য মেয়ে এই সুবালা, কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ-ই ধরে এলো গলা, কান্নার আবেগে কণ্ঠ গেল রুদ্ধ হয়ে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, তা হলে ? এই তোমার ঘর ? ভালোই ত আছো।

তেমনি কান্নাভরা স্বরেই বললে, হ্যাঁ, ভালো আছি, খুবই ভালো আছি।

আবার চুপচাপ। বললাম,—কবিগুরু বলেছেন, মেয়েরা হচ্ছে সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানী। চারটে দেয়াল ঘেরা ছোট ঘরখানাতেই তাদের সব-কিছু, সব আশা, সব আকাঙ্খা, সব স্বপ্ন! এইটুকুর মধ্যেই এসে ধরা দেয় স্বর্গ, তাই না ?

চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কথাটা ত সত্যিই। আর কী চাই আমরা ? তোমাদের ভালোবেসে, তোমাদের সেবা করে, তোমাদের জীবনে প্রেরণা দিয়ে, শেষে তোমাদেরি কোলে এইরকম ঘরটুকুর মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলব, এর থেকে বড়ো কামনা কোনো মেয়েরই থাকে না। কিন্তু—

—কিন্তু ?

দুটি স্নিগ্ধ চোখ মেলল আমার দিকে, বলল, জানতে ইচ্ছা করে না আমার কথা ?

সাগ্রহে বলে উঠলাম, করে। এতবেশী করে যে, পাছে ভুল বোঝো, তাই জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করে।

সুবালা চেয়ারটা টেনে আরও ঘন হয়ে বসল। চকিত হয়ে বলে উঠলাম, এত কাছে এসো না! তোমার ননদ কী মনে করবে?

—কিছুই মনে করবে না। পড়ায় মগ্ন। তাছাড়া আড়িপাতা ওর স্বভাব নয়।

—তা হলেও—

বাধা দিয়ে বলে উঠল, এক ভয় শাশুড়ীকে। কিন্তু তাঁর ফিরতে যার নাম বারোটা। এদের ভাই বোন বড়ো শক্ত ধাতুতে গড়া। নইলে দেখ না, এদেরই ত বড়ো ভাই, ভালোবেসে একটা বাইরের মেয়েকে বিয়ে করে একেবারে ঘরে এনে তোলে? ঐ দেখ, কোন দিন ত দেখনি, ঐ হলো ফটো।

প্রথমেই চোখে পড়া উচিত ছিল, টেবিলটার পিছনের দেয়ালে মাঝারী আকারের একটা ফটো। প্রশস্ত ললাট, সার্ট আর টাই-পরা দিব্যি ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বললাম—ঘরই যখন পেলে, তখন করছ কেন আর বাইরের কাজ?

বললে, ছিঃ! দেওর-ননদ দুজনেই কলেজে পড়ে। আজকালকার দিনের একটা সংসার—ও একা চালাতে পারবে কেন?

—আপত্তি করেন না?

—করলেই বা শুনছে কে? আমার চোখ নেই? ও উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটবে, আর আমি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে খাবো, না?

অল্প একটু হেসে বললাম, খুব ভালোবাসো বুঝি?

ও-ও হাসল, বেদনার্ত অদ্ভুত এক হাসি। বললে, মানুষের হৃদপিণ্ড কটি? একটি, না দুটি? আমার বোধহয় দুটি। একটি তুমি, অপরটি সে।

চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। ফটোটির দিকে তাকিয়ে আমার কিন্তু কোনো ঈর্ষার ভাব এলো না মনে, বরংচ, অদ্ভুৎ একটা মায়া আর

মমতায় হৃদয় উঠল মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে। বললাম, বিয়ে করেছ কি রেজেস্ট্রী করে ?

—না।

—তবে ?

—নাই-বা শুনলে এ 'তবে'র উত্তর।

—বেশ। কবে আলাপ হলো, কোথায় আলাপ হলো, সে সব কথা বলবে ত ?

ভারী কোমল আর স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। বলল, বলব গো, বলব স-ব তোমাকে বলব। 'তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার, নামাতে পারি যদি মনোভার !'

কী বলতে গিয়ে থেমে গেল সে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠল, আচ্ছা, একটা কথা। তোমার চেহারা কী তেমন বদলেছে ? আমার মনে হয়,—না, একটু বয়সের ছাপ পড়েছে মাত্র। পনেরো বছর আগে তোমাকে যারা দেখেছে তারা পনেরো বছর পরে আজ যদি দেখে ত চিনতে পারবে না কি সঙ্গে সঙ্গে ?

—পারবে নাকি ?

—ওমা ! পারবে না। 'পাদপ্রদীপ' থিয়েটারে এখন সব নতুন লোক পুরোনো লোক একটিও নেই তাই রক্ষে। থাকলে কী হতো বলো ত ?

একটু কঠিন স্বরেই বলে উঠলাম, এসব কথা তুমি থামাবে কি না বলো !

ম্লান একটু হেসে বললে, থেমেই ত আছি।

একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপরে আবার ও বলতে শুরু করল, মা নাচ শেখাতে লাগল, গান শেখাতে লাগল। থিয়েটারে নাচের মেয়ে হয়ে নাচতে লাগলুম নানান্ পোশাক পরে, নানান্ রঙে, নানান্ ঢংয়ে। কখনো প্রাচীন ইতিহাসের হিন্দুরাজার সভায়, কখনো মুসলমান-সম্রাটের দরবারে,

কখনো ফিরিঙ্গী সেনাপতির হল-ঘরে। এসব দিনের কথা শুনতে চেও না, দুঃখ পাবে, ব্যথাও পাবে। একবার একটা রোগও হলো, মরণাপন্ন হয়ে বেশ কয়েক মাস কাটিয়ে ছিলুম এক ডাক্তারের প্রাইভেট হাসপাতালের কেবিনে। যা কিছু জমিয়েছিলাম, সব গেল জলের মতো খরচ হয়ে। কাজটাও গেল। পরে একটা অপারেশানও করতে হয়েছিল। ডাক্তার বললে—আপনি আর কোন দিন মা হতে পারঁবেন না। মনে মনে ভাবলাঁম, নাই বা হলাম, আমার যেটি আছে সেটিই বেঁচেবর্তে থাক।

বলে উঠলাম, খোকা হয়েছিল তোমার ?

—হ্যাঁ! কেঁপে গেল কণ্ঠস্বর, তবু কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিতে নিতে বললে, রাজপুত্রের মতো ছেলে আমার। আট বছর বয়েস হয়েছিল, তারপরেই মারা গেল।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। টাইফয়েড হয়েছিল! রাগে-দুঃখে সেদিন তার ফটো-গুলোও ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। নইলে, তুমি দেখতে পেতে—

একটু থেমে আবার বলতে লাগল, লোকে বলত, মায়েরই ছেলে। ঠিক আমারই মতো হয়েছিল মুখ, চোখ, ঠোঁট, সব। আমার মা-ই ওকে মানুষ করত। আমি আর কতোটুকু দেখতাম! কিন্তু মা গেল আগের বছর, ও গেল তার পরেই—বছর ঘুরতে না ঘুরতে। তেমন যত্ন করতে পারতাম না ত, সেই অভিমানেই বুঝি ছেড়ে চলে গেল! যাবার সময়, শ্বাস উঠেছে—আমি ত বুঝিনি! ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম, খোকন, খোকন আমার! চোখ মেলে যেন চিনতে পেরেছিল, কথা ত বলতে পারেনি, দুটি চোখ বেয়ে দুটি ধারা অবিরল বইতে লাগল! বাবা গো! সে দৃশ্য সহ্য করবে, এমন পাষাণ কে আছে ?

টেবিলে মুখ রেখে এতক্ষণে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সুবালা।

ভিতরের দরজায় পরমুহূর্তেই ছুটে এসে দাঁড়ালো ওর ননদ, মঞ্জু।

হাতে তার তখনো একখানা বই। ধীর পায়ে তার বৌদির কাছে দাঁড়াতেই পড়তে পারলাম বইটার নাম। ইন্ডাক্‌টিভ লজিকের একখানা বই। মঞ্জু বললে, কাঁদছে কেন বৌদি ?

তারপরেই ওর পিঠে হাত বুলাতে-বুলাতে কোমলকণ্ঠে ডেকে উঠল, বৌদি !

টেবিল থেকে মুখ তুলল সুবালা, মঞ্জুর হাতটা ধরে বললে, বহুদিনের চেনা লোক ত ? আমার মাকে চিনত। তাই মায়ের কথা বলতে বলতে আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না ভাই।

বৌদির কপালের চূর্ণালকগুলি সস্নেহে ঠিক করে দিল মঞ্জু, তারপরে যেমন এসেছিল, তেমনি ধীর পায়ে চলে গেল নিজের পড়ার ঘরে।

চোখের জল মুছতে মুছতে চাপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, এরা কেউ জানে না যে আমার কোনও দিন আর খোকা হবে না ! এই দেখ না, কতো তাবিজ আর মাদুলী পরিয়ে দিয়েছেন শাশুড়ী। চার বছরেরও বেশী হয়ে গেল এদের ঘরে আমি এসেছি, এখনো কোলে খোকা এলো না কেন, শাশুড়ীর আর চিন্তার অবধি নেই !

—মিস্টার ঘোষও এসব কী জানেন না কিছু ?

—না।

টিক্ টিক্ করে কোথায় যেন ঘড়ীর কাঁটা সরে যাচ্ছে, তারি শব্দ কিছুক্ষণ শুনতে শুনতে বললাম, কিন্তু, তারপর ?

বললে, সংসার চালাতে হবে ত ? আমার মা ? আমার ছেলে ? ওরা যাবে কোথায় ? ছেলের যে বাপ, আমার মা-ই জুটিয়েছিল তাকে, সে কোথায় কোন্ দূররাজ্যে নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত ! আমাকে নিয়ে পুতুল-খেলার নেশা বহু পূর্বেই তার কেটে গেছে। অতএব, একটা থিয়েটারেই কাজ নিলাম। এবার শুধু নাচ না, অভিনয়ও। এখানেই তার সঙ্গে আমার আলাপ।

—কে? মিস্টার ঘোষ?

—না। ইংরেজী কায়দাতেই যদি তাকে ডাকতে হয় ত, সে হচ্ছে মিস্টার বক্সী। বড়লোক, ঐ থিয়েটারেই সখ করে দিনকয়েকের জন্য সে টাকার জোরে নায়ক সাজতে এসেছিল। আমার ডবল ছিল তখন তার বয়েস। তবু সুপুরুষ বলতে হবে, টক্‌টক্ করছে তার গায়ের রঙ! শুনবে তার গল্প?

—না। কিন্তু, এর কথা মিস্টার ঘোষ জানে?

—হ্যাঁ। শুধু এর কথাই জানে, তার আগের কিছুই না।

বলে ফেললাম, ভালোবেসেছিলে বুঝি একেও?

ম্লান একটু হেসে বললে, ভালবাসা যে কি বস্তু, সেটা বুঝে উঠতে কারুর কারুর একটা জীবনও চলে যায়! আমার এ ব্যাপারটাকে 'ভালবাসা' বলবে কি অন্য-কিছু বলবে, তা জানি না। আমি ছিলুম এর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার খোকাকে বড়ো ভালোবাসত এই বক্সী। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

একটু থেমে তারপরে বললে, তাছাড়া, আরও কোন্ সর্বনাশের অতল তলে তলিয়ে যেতাম তা' কে জানে, আমাকে আশ্রয় দিয়ে ওই তখন বাঁচিয়েছিল আমাকে।

মনে মনে কী-এক অস্বস্তি অনুভব করে উঠে দাঁড়িয়েছি এতক্ষণে। ও বললে, একী, উঠলে কেন?

বললাম, বেশ রাত হয়ে গেছে। এবার আমাকে যেতেই হবে।

আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। নিজেই খিলটা খুলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে হন্‌হন্ করে নেমে এলাম পথে।

কেমন যেন শ্রান্ত লাগছিল নিজেকে। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি আমার

সমস্ত শরীরটাকে এমন অবশ করে দিয়েছে, যেন ছু' পা হেঁটে বাস ধরার পর্যন্ত আমার ক্ষমতা নেই। হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সী ডেকে তাতে তাড়াতাড়ি এলিয়ে দিলাম নিজেকে। বললাম, চলো, দক্ষিণে।

রাত প্রায় এগারোটা, কিন্তু তখনো ঘুমোয়নি আরতি। খুব শীগগির শীগগিরই ও ঘুমিয়ে পড়ে, প্রায় রুণু আর ঝুনুর সঙ্গেই। আমার খাবারটা ঢাকা থাকে টেবিলে। সদর পেরিয়ে ঘরে এসে বললাম, ঘুমাওনি এখনও?

—এলো না ঘুম।

খাবার সাজিয়ে এনে দিলো। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরতে থাকা সত্ত্বেও হাতপাখা নিয়ে কাছে এসে বসল, বললে, হ্যাঁ গো, তোমাদের রিহার্স্যাল দেখাতে নিয়ে যাবে একদিন?

ওর মুখে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এ প্রশ্ন। থিয়েটার দেখার আগ্রহ নেই, সিনেমা দেখার আগ্রহ নেই, পত্রিকা পড়েই ওসব স্বাদ ওর মিটে যায়। বাইরে বেরুবার জন্য খুব বেশী টানাটানি করলে বলে, সত্যি বলব? একটু গাছপালা দেখাতে নিয়ে যাবে?

—গাছপালা!

ছেলেমানুষের মতোই বলে ওঠে, চারদিকে ইঁট আর ইঁট, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে! আমাদের গাঁয়ে কতো গাছপালা—কতো বন—কতো মেঠোপথ! হ্যাঁ গো, কাছে-পিঠে কোনো গাঁ-টা নেই? একটু দেখিয়ে আনবে চলো না?

হ্যাঁ, তা সিনেমা-দেখার চেয়েও বেশী খরচ হয়। মোটরে করে গাঁ বেড়াতে যাওয়া আর আসা। কিন্তু কী অদ্ভুত আনন্দ যে পায় ও!

পুকুরে হাঁস দেখে হাত-তালি দিয়ে ওঠে, বলে, ঐ দেখ গো দেখ, কতো হাঁস! আমাদের গাঁয়ের রানীপুকুরের মতন একেবারে!

সেই আরতির মুখে রিহার্স্যাল দেখার কথা শুনে সহজেই অবাক হবার পালা। বললাম, কেন ?

বলল, বেশ মেয়ে সুবালা। ও কেমন করে সেজেটেজে অভিনয় করে একটু দেখতাম।

বললাম, তা সে আবার রিহার্স্যাল কেন ? সামনের শনিবার যেও, একেবারে থিয়েটার দেখে আসবে। হ্যাঁ, তোমার সুবালারই থিয়েটার।

—না-না, তা কেন ? আরতি প্রতিবাদ কবে ওঠে।—থিয়েটাব কেন ? ও বাড়ির পারুলদি বলতো কিনা, থিয়েটারের মেয়েরা যে কাঁদে, সে নাকি চোখে কী একটা জ্বালা করা ওষুধ দিয়ে তবে কাঁদে। আমি সুবালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও বললে, নাগো দিদি, তুমি একদিন দেখতে যেও, ওষুধ-বিষুধ নয়, সত্যিই আমরা কাঁদি ! তা হ্যাঁ গো, নিয়ে চলো না রিহার্স্যালে, আমি নিজেব চোখে দেখব, ও কাঁদবার আগে চোখে কিছু দেয় কি না। সুবালা বলেছে, বইতে কাঁদবার সিন আছে।

অল্প একটু হেসে বললাম, সে সিন কিন্তু তোমার স্বামীরই সৃষ্টি !

উজ্জ্বল একটা আভায় ভরে গেল ওব মুখ, বললে, জানি গো জানি, আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক বলে কি জানি না, তুমি কতো বড়ো মানুষ ? টাকা পয়সা আমাদের নেই, কিন্তু নাই বা রইল ! লোকে ত খাতির করে ! ওই যে সুবালা এসেছিল, পাড়ার মেয়েরা বিশ্বাসই করতে চায় না ! বলে, অ্যাঁ, সত্যিই সুবালা ঘোষ এসেছিল আপনাদের বাড়ী ? বললাম, হ্যাঁ, আমার স্বামীর থিয়েটারে কাজ করে !

হো-হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, তোমার স্বামীর থিয়েটার কি গো ?

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাইরে থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বিছানায় আরাম করে বসে পড়ে বললাম, অমন বোলো না, লোকে হাসবে।

—হাসুক। আরতি বললে, আমার ত ঝগড়াই হয়ে গেল।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে বললাম, কার সঙ্গে? ঝগড়া করতে তুমি পারো নাকি?

বললে, ঈস্, পারি না আবার! দিলুম দু' কথা শুনিয়ে।

—কাকে?

—ঐ ওদের বাড়ীর শশীমুখীকে। ভারী ত মেয়ে। তা-ও যদি ঘরে নতো স্বামী! মুখ থুবড়ে পড়ে ত আছে বাপের বাড়ীতে।

—কী, বলেছিল কী?

আরতি বললে, কী বলে জানো? বলে, তোমার স্বামী বুঝি থিয়েটার করে? তাই বাড়ী আসে অতো রাত্তিরে? এক একদিন আবার রিক্সার টুংটাংও শুনতে পাই—মদটদ খায় বুঝি?—দেখ একবার! আমিই বা সইবো কেন? বললাম, মহাদেবের মতো আমার স্বামী, তার নামে ও-সব বললে জিভ খসে যাবে।—শুনে আরও জ্বলে উঠল, বললে, মহাদেবের জটায় আবার গঙ্গা লুকিয়ে ছিল। দেখো ভাই, তোমার মহাদেবের আবার লুকানো গঙ্গাটঙ্গা কোথাও নেই ত! এই না বলে ওদের সে কী হাসি!

দুটি হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলাম ওকে, বললাম, দূর! এসব কথায় কী কান দিতে আছে?

আরতি বললে, এসব কী জানো? লোকের হিংসে, আর কিছু না। তুমি যে আমাকে একটু বেশী ভালোবাস, সেটা কেউ সইতে পারে না!

সমস্ত কোলাহল থেমে গিয়ে নিশুতি হয়ে গেছে রাত। তন্দ্রার একটা ঘোর এসেছিল, হঠাৎই সেটা কেটে গেল। কে জানে কতো রাত! নানান চিন্তার এলোমেলো ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে আছে মস্তিষ্ক। পাখাটা ভাড়া করা, তার জন্য ছ' টাকা,—তারপরে আছে বাড়ী ভাড়া,

আছে মুদি, আছে গোয়ালা, আছে রুণুর ইস্কুল—হয়ে আসছে মাসকাবার, এ সব টাকা সংগ্রহ করা চাই। ফিল্ম-জগতের এক ভদ্রলোক নাটকীয় গল্প শুনতে চেয়েছেন একটা, কাল সকালে উঠে তার বাড়ীতে না হয় যাবো। কিন্তু, কী গল্প?

মাথার চুলের একটা গোছা টানতে টানতে চিন্তা করছিলাম। কিন্তু কিছুই আর ধরা দিতে চায় না অনুভূতির ক্ষেত্রে ঐ প্রাচীনা দেবদাসী সুতনুকা ভিন্ন। যেমন এক-একদিন এক-একটা গানের কলি পেয়ে বসে এক-একজন সঙ্গীত শিল্পীকে, তেমনি হয়েছে আমার মনের অবস্থা। নতুন যে গানের ছেলেটি এসেছে আমাদের ওখানে, অসিত বুঝি নাম, একদিন বলেছিল ঠিক এমনি ধরণের একটা কথাই। বিকেলে তার কী যেন চটুল ধরণের একখানা গান রেকর্ড করা হবে বুঝি কোন স্টুডিওতে, কিন্তু সকাল থেকেই তাকে পেয়ে বসল অন্য এক ভাবনার গানের কলি, 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।' আমাকেও তেমনি পেয়ে বসেছে সুতনুকার কথা। সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি···

সমস্ত-কিছুই জীবনে যখন বেসুর হয়ে যেতে চায়, তখন হয়ত এমনি কোনো খেয়ালের ভাব আর ভাবনাই নিজের অলক্ষ্যে ভিতরে-ভিতরে সুরবাঁধা শুরু করে দেয়, তার সন্ধান সব সময় পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায়, তখন অবাক হয়ে নিজেকেই নিজেরা আমরা দেখি। তাই উপবাস-খিন্ন অভাবজীর্ণ দারিদ্রতার মধ্যেও কখন কোন শুভ মুহূর্তে যেন ফুটে ওঠে অনির্বচনীয় অনৈসর্গিক কোনো আনন্দ-ফুল, তার সৌরভে কস্তুরীমৃগের মতই আমরা অস্থির হয়ে ফিরি, কোনো দিশা খুঁজে পাই না।

স্বপ্নের মতো মনে জেগে ওঠে যোগিমারার সেই গুহা। হাওড়া থেকে খড়্গপুর, তারপর ঘাটশিলা, টাটানগর, চক্রধরপুর, রৌঢ়কেলা আর

ঝারসুগুদা। সুন্দর সেই স্টেশনের নামগুলি ঝারসুগুদার পর থেকে। ইব, ব্রজরাজনগর, বেলপাহাড়, হিমগির, এইসব নাম। ওরই কয়েকটা স্টেশন পরে খারসিয়া। এই খারসিয়া থেকে আন্দাজ এক শ' মাইল দূরে হল সীতাবেঙ্গা আর যোগিমারার গুহা। আপরিতোষাদ্ বিদূষাম্ ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম। 'বিদূষাম্' অর্থাৎ সমাগত দর্শকমণ্ডলী যতক্ষণ না পর্যন্ত 'পরিতোষ' লাভ করছেন, ততক্ষণ শিল্প, নৃত্য ও নাট্যের যে 'প্রয়োগবিজ্ঞান', তার কোনোই সার্থকতা নেই। যুঁই ফুলের মালা গলায় দিয়ে 'বিদূষাম্' সমাগত হয়েছেন গুহা-সম্মুখের চক্রাকার আসন-বেষ্টনীতে। তাঁদেরই সামনে একসময়ে এসে দাঁড়ালো মোহিনীমায়ার মতো সুতনুকা উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে। অবিকল সেই প্রাচীন পরিবেশ, শুধু সুতনুকার মুখখানা যেন সুবালার মতো।

ঠক করে একখানা হাত এসে পড়ল গায়ের ওপরে। অন্য অন্যদিন রুণু শুয়ে থাকে আমার পাশে ঘুমন্ত ছোট হাতখানা আমার গলার ওপর রেখে। চেয়ে দেখি, আজ রুণু নেই পাশে, শুয়ে আছে আরতি, লতার মতো। বালিশ থেকে মাথাটা নেমে এসে আমার বুকের কাছে সংলগ্ন হয়ে আছে। তার অসহায় দেহভঙ্গী যেন নীরবে এই কথাই বলতে চায়, ওগো, কেউ যে নেই আমার তুমি ছাড়া!

দুর্বার স্নেহে ভরে ওঠে মনটা। ওর খোলা চুলের ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে মনে ভাবি, কী অদ্ভুত বিশ্বাস আমার ওপরে! ও যদি কোনদিন জানতে পারে সুবালার কথা, তা হলে বুকটা ওর বোধহয় ভেঙে যাবে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম বিছানা ছেড়ে। আলোটা জ্বেলে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে আবার এসে বসলাম বিছানায়। স্বপ্নের ঘোরে ঝুনু বোধ হয় এক সময় কেঁদে উঠল। তার পিঠটা একটু চাপড়ে তাকে শান্ত করে ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। আরতির

মুখখানা বড়ো ছেলেমানুষীতে ভরা। একেকটা মানুষ থাকে, যারা সংসারের উত্তাপেও ম্লান হয় না, একটা সজীব শিশুমন নিয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। আরতি বোধহয় সেই জাতের। এক-একবার ভাবি, কেন সে বিয়ে করতে গেল আমাকে! যে-আমি নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম দূরে, তাকে স্নেহের ডোরে এমন করে বেঁধে নিজের কাছে কেন এই টেনে আনা?

কে যেন একবার বলেছিলেন, মানুষের জীবনে প্রেম একটা জটিল সমস্যা। তা সে সুসভ্য নগরীতেই হোক, অথবা নিবিড় অবণ্যেব আদিম ছায়াতলেই হোক। যুগে যুগে এব চেহারাটা বদলায়, বিবর্তিত হয় এর রঙ, কিন্তু শ্বাশ্বত প্রেমের ক্ষুধা একই থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে পুরাকালের কন্যা এবং একালেব কন্যায় কোনো ভেদ নেই। আজ বেশ অনুধাবন করতে পারছি এই চিন্তার ধারা। আরতি এলো আমার জীবনে, বেশ ত ছিল সুখদুঃখেব একটি রাগিনীর আলাপন, কিন্তু, আজকাল মনে হচ্ছে, স্নেহ আর প্রেম এক কথা নয়, যেমন এক কথা নয়, কাম আর প্রেম। আজ যে অনুভূতিতে আমাব হৃদয় হচ্ছে মথিত, তার স্বাদটা ভিন্ন,—তার সুখটাও যেমন বিরাট, দুঃখটাও বিরাট। ভালোবাসা যে কী নিদারুণ বেদনাব রূপ নিয়ে আসতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি আজ, পলে-পলে, তিলে-তিলে।

দিন চার পাঁচেক পবে আবার দেখা হল সবার সঙ্গে। অঞ্জলি এগিয়ে এসে বললে, খবর শুনেছেন?

—কী?

একটু দম নিয়ে অঞ্জলি বললে, বেলগাছিয়ায় যে জৈন মন্দিরটা আছে সেখানে সেদিন বিকেলে বেড়াতে গেছি, গিয়ে দেখি, ব্যস্, কপোত-কপোতী।

—মানে ?

ছুটি চোখ তার কৌতুকে ঝলমল করছে, বললে, নিশীথকুমার আর সুবালা।

বললাম, এ খবর আর কাউকে বলেছো ?

—দূর! অঞ্জলি বললে, তাই কি বলা যায় নাকি? আমি আপনাকেই বললুম। ঘেন্না—ঘেন্না!

—ঘেন্না কেন ?

—ছুটি লোককে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! লজ্জাও করে না! ঘরে শাশুড়ী, ননদ, স্বামী। তাব ওপরে এই ?

একটু হেসে তারপরে বললাম, ছুটি লোক কোথায় দেখলে ?

—কেন, একটি নিশীথ, আব একটি আপনি ?

—আমি!

—হ্যাঁ। অঞ্জলি বললে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি। কী পেলেন ঐ মেয়েটার মধ্যে ?

এদের কিছু বলা বৃথা। তাই একটু হেসে সরে এলাম অন্যধারে। কাজ শেষ করে পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছি, দেখি সিঁড়ির একটা ধাপে অন্ধকারে বিলীন হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। অভিনয়ের যবনিকা এখনো পড়েনি, বোধহয় নিশীথের গান ভেসে আসছে মঞ্চ থেকে। মনে পড়ল, এর পরেই ত সেই দৃশ্যটা। যেখানে নিশীথ জড়িয়ে ধরবে সুবালাকে, আর অন্ধকার হয়ে যাবে সব-কিছু, মঞ্চ ঘুরে যাবে। সিঁড়ির আরও ছু-তিনটি ধাপ নেমে প্রশ্ন করলাম, কে এখানে বসে ?

মেয়েটি মুখ তুলল, বলল, আমি কাজল।

—কাজল ? এখানে এমনভাবে বসে ? সিন হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।—কী হয়েছে রে বোন ?

উঠে দাঁড়িয়েছিল, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল এবারে। বললে, শঙ্করের কথা বলেছিলাম না তোমাকে ? তাকে সেদিন সব বলেছি। বলেছি যে বিবাহিত হয়েছিলাম আমি, আমার ছেলেমেয়েও আছে।

—তারপর ?

—সে চলে গেছে। আর আসবে না কাছে।

চট্ করে সরে এলাম ওর কাছ থেকে। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে, ঘুরতে আরম্ভ করছে মঞ্চ। পাছে কিছু চোখে পড়ে যায়, তাই ওখান থেকে সরে এলাম তাড়াতাড়ি।

কিন্তু রক্ষা নেই প্রণবেশের হাত থেকে। উত্তেজিত ভঙ্গিমায় সে ছুটে এসে দাঁড়ালো অফিসঘরের মধ্যে। বললে, এই যে, তোমাকেই খুঁজছি। আজকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। তোমাকে বদলাতেই হবে ও সিকোয়েন্স্।

বললাম, আর্টের খাতিরে বদলাতে পারি না। দরকার হয়, তুমি পাত্রপাত্রী বদলে দাও।

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে রইল আমার কথা শুনে। তারপরে বললে, আর্টের চর্চা হয় বলে এসব ইম্‌মরালিটির আমি প্রশ্রয় দোবো না। এইসব দু একটা লোকের জন্যই বাইরের লোক আমাদের যা তা ভাবে। দরকার হয়, সত্যিই পাত্রপাত্রী বদলে দেবো।

হেসে বললাম, বদলে যাদের আনবে, তারাও যে ঐরকম হবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে ?

—হয়ত নেই! প্রণবেশ ঘুরে দাঁড়ালো।—তা বলে এ সব চলতে দেওয়া ঠিক নয়।

বলে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ালো প্রণবেশ,

তারপরে আবার এসে দাঁড়ালো আমার মুখোমুখি, বললে, একটা কথা বলব ?

—বলো।

—তুমি কিন্তু একটা কাজ করতে পার !

—কী ?

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নিশীথকে তাড়িয়ে দিতে পার ওর কাছ থেকে।

বললাম, চেষ্টা করব।

ও কিন্তু আর দাঁড়াল না, চলে গেল হন্‌হন্‌ করে।

প্রণবেশ কী চায় আমি বুঝেছি। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। কিন্তু ওর জন্য নয়, নিজের জন্যও আমাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

এর দিন দুয়েক পরেই বোধ হয় দেখা করেছিলাম সুবালার সঙ্গে। একটা ছায়াছবির স্টুডিও থেকে ওকে নিয়ে গেলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে। ওপরের দুটি ঘর নিয়ে বন্ধুটি থাকে, নিচের অংশগুলি দিয়েছে ভাড়া। বন্ধু অকৃতদার, কঠোর অধ্যাপনার তপ নিয়ে ব্যস্ত। তাকে সব বলতেই সে বললে, পাশের ঘরে বসে যতক্ষণ ইচ্ছা গল্প কর তোমরা, কেউ ডিসটার্ব করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কী হে ? সাত দেশ ঘুরে শেষে এইখানে এসে পিছলে পড়লে ? দূর, দূর—আছে কী এ সব মেয়েদের মধ্যে ? রোমান্স করছ, রোমান্সের 'র' এরা জানে ? মহৎ থেকে জীবনকে মহীয়ান করার নামই জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স। কিন্তু এরা ? এরা বড্ড বেশী রিয়ালিস্টিক।

অধ্যাপক বন্ধুটির সঙ্গে ভদ্রতাসুলভ দুটো একটা কথা বলেই আমার পিছনে-পিছনে বন্ধুর বসবার ঘরটিতে এসে বসল। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে বন্ধু বললে, না ডাকলে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

সোফার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিতে দিতে সুবালা বললে, হঠাৎ এমন সুমতি? একেবারে গরজ করে নিজে থেকে ডেকে নিয়ে আসা?

বললাম, জরুরী দরকার বলেই ডেকেছি। আর শুধু ডাকা নয়, কেমন পাকা ব্যবস্থা করেছি দেখছ ত? বন্ধুটি উদার মতাবলম্বী, কিছু মনে করবে না।

মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল সুবালা। বললে, কাছে এস, অত দূরে-দূরে বসলে কেন?

—কাছে আসবার অধিকার কোথায়?

মুহূর্তে সোজা হয়ে বসল সুবালা। বলল, কী হল! অধিকার নেই?

আমি নিরুত্তরে ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসলাম লক্ষ্য করে ও সোফা ছেড়ে আমার কাউচের হাতলে এসে বসল। বলল, কী জন্য ডেকেছ বল?

একটু থেমে বললাম, মনে কিছু করবে না ত? তোমার কাহিনী ভালো করে শুনতে চাই। বিশেষ করে মিস্টার ঘোষের কথা।

শোনামাত্রই উঠে দাঁড়াল, সরে গেল আমার কাছ থেকে। বসল গিয়ে অদূরের সোফাটায়। মুখ নীচু করে রইল। বেশ কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে পার হয়ে যাবার পর একসময় বলে উঠলাম, রাগ করলে নাকি?

মাথা নেড়ে জানাল,—না।

—তোমার যদি বলতে কষ্ট হয়, ত, থাক।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না-না, কষ্ট কী!

উঠে কাছে গিয়ে বসলাম ওর। বাঁকা একটু হেসে বললে, আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বললাম,—বল?

বললে, হঠাৎ এভাবে আমার কথা শোনবার ইচ্ছা হল কেন?

একটুক্ষণ থেকে থেকে, তারপরে একটু হেসে বলে উঠলাম, সত্যি

কথা বলব? একটা ছবির গল্পের জন্য প্লট খুঁজছি মনে মনে। ভাবলাম তোমার কাহিনী কাজে লাগালে কেমন হয়?

বলল, আমার থেকে তোমার নিজের কাহিনী কি কম বিচিত্র নাকি?

হেসে উঠলাম, বললাম, সে কথা বলতে গেলেও যে তোমার কথা এসে পড়বে।

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল ওর মুখ, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলল না অথবা বলতে পারল না। ওর হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বললাম, থাক গো, বলতে হবে না।

আমার মুখেব দিকে চোখ তুলে তাকালো, অদ্ভুৎ বেদনার্ত সেই দৃষ্টি। ঘোষকে নিয়ে এসেছিল বক্সীই, আমাব খোকাকে পড়ানোর জন্য। ইয়ংম্যান, কিন্তু জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। দেশে যা-কিছু ছিল, সব গেছে। নিঃস্ব হয়ে ভাইবোনদের হাত ধরে এসেছে কলকাতায়। বাপ গেছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় মারা।

বললাম, মায়া হল বুঝি তার সবকথা শুনে?

বলল, শুধু মায়া নয়, শ্রদ্ধাও। লোকটা এততেও ভেঙে পড়েনি। কী অধ্যবসায়, নতুন কবে নিজেকে গড়ে তোলবাব সে কী প্রয়াস! কী-একটা চাকরী করত তখন, আব রাত্রে পড়ত যেন কোন্ কলেজে! খোকাকে পড়ানো আর একবেলার খাওয়া ছিল বরাদ্দ। বক্সীই এনেছিল ওকে, বক্সীই সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে দিয়েছিল। একদিন গিয়ে বললাম, —আমাকেও পড়াবেন?

—আপনি!

—হ্যাঁ। আমি পড়ব। আমারও ত পড়তে ইচ্ছা করে!

বক্সীর অনুমতি নিয়েই পড়া শুরু করলাম। একই টেবিলের দুদিকে দুজনে বসে পড়তাম। সেও পড়ে, আমি পড়ি। দিন যায়। আমি

প্রাইভেটে ম্যাট্রিকটা পাশও করলাম এ-ভাবে। ততদিনে আমার খোকা আমাকে ছেড়ে গেছে, ও আমাকেই পড়ায়। আমার পাশের খবর শুনে বক্সী সেদিন একটা রীতিমত ভোজেরই ব্যবস্থা করেছিল বন্ধুবান্ধব নিয়ে।

বলতে বলতে হেসেই উঠল আপনমনে, বললে, আজও যেন ভাসছে চোখের সামনে সেদিনের সেই ঘটনা!

আস্তে, কোমলকণ্ঠে বললাম,—বলো?

অদ্ভুৎ মাদকতা-ভরা শোনাতে লাগল ওর কণ্ঠস্বর, বললে, নিজের হাতে একটা ঘাঘ্‌রা পরিয়ে দিয়েছিল আমাকে বক্সী,—হলদে, লাল, নীল, সবুজ,—এইসব রঙে রঙীন করা। ঘোর লালরঙের আঁটোসাঁটো একটা সাটিনের ব্লাউজ ছিল গায়ে। তার ওপরে ফিকে-গোলাপী মস্‌লিনের ওড়্‌না। নীচের ঘরে একা বসে যেমন সে পড়ে, তেমনি সে সেদিন তার নিজের পড়ায় মত্ত, আর আমি ওপরে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ঘুরেঘুরে নাচছি, আর মাঝে মাঝে নাচ থামিয়ে গান ধরছি,—তন্‌মনমে নাচি গাহই ফয়দা না মিলয়!

স্বপারিষদ বক্সী কিন্তু খুব খুসী। খুব বেশী রাত তার কোনদিনই হয় না যেতে,—কিন্তু, সেদিন তার বিদায় নিতে সত্যিই বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্ত শরীরে, টলোমলো পদক্ষেপে তাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখি, পড়ার ঘরে তখনো জ্বলছে আলো। দেখি, সময়ের জ্ঞান নেই, একমনে পড়ায় মগ্ন। অলক্ষ্য থেকে দেখতে দেখতে কেন যেন হঠাৎ মোহ জন্মে গেল। আস্তে আস্তে ওর সামনের চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে নিয়েই মুখ নীচু করল। ওকে 'আপনি' করেই বরাবর ডাকতাম, সেদিন কা হলো কে জানে, জড়িত জিহ্বায়,—'তুমি' বলে ফেললাম। বললাম, রাত একটা বেজে গেছে। বাড়ী যাবে না?

চমকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো,—অ্যাঁ! রাত একটা

বললাম,—খেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

বললাম,—এত রাত্রে আর গিয়ে কাজ নেই, থেকে যাও।

আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরণে তখনো আমার সেই সাটিনের জামা। কী দেখতে-দেখতে হঠাৎ-ই হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ধরল আমার হাত দুটো। বলল, তোমার এখানে বড়ো কষ্ট, না ?

—কষ্ট !

হেসে উঠলাম খিলখিল করে, কষ্ট কীসের ? সুখেই ত আছি !

মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, না-না একে সুখ বলে না ! আচ্ছা তোমার স্বামী ছিল ?

—স্বামী ! যেন আমার ভিতরের সত্ত্বাটাকে ধরে দু' হাতে প্রাণপণে নাড়া দিলো কেউ। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলাম, এমন করে বললে কেন তুমি ! সবই পেয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই রাখতে পারিনি আমি।

আশ্চর্য দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছিল ও সেদিন রাত্রে, বললে, আমার সঙ্গে যাবে ? থাকবে আমার সঙ্গে ? আমি দেবো তোমাকে ঘর-সংসার। আমি হব তোমার স্বামী !

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে সেদিন তাকিয়ে ছিলাম, বলেছিলাম,—তোমার আজ কী হয়েছে বলো ত ? বাড়ী যাও।

একটুক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে কোনো কথা না বলে দ্রুত চলে গেল ঘর ছেড়ে।

পরদিন থেকে আবার পড়ার পালা। দু' তিন দিন ও সব প্রসঙ্গ আর ওঠেনি। কিন্তু তারপরের দিন চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ ও উঠে দাঁড়াল, বললে, আমি আর পড়াতে পারব না। ছুটি চাইছি।

—ক'দিনের ?

—চিরদিনের।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কী হয়েছে কী? পাগলামীর ভূত কী মাথা থেকে নামেনি? একটা বাইরের মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে, লোকে শুনলেই বা বলবে কী?

বললে, লোক নিয়ে ত আর আমার মন চলবে না?

তারপরেই আমার হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগল, এমনভাবে জীবনযাপন করতে তোমাকে আমি দেবো না। চলো, চলো তুমি আমার সঙ্গে!

বললাম, কাঙালকে এমন করে লোভ দেখিও না।

—লোভ নয়, লোভ নয়!—ও বলে উঠল,—কাঙালের মতো হাত পেতে ভিক্ষা চাইছি।

বলতে বলতে, অতি অদ্ভুত, আমার কোলের কাছে সত্যি সত্যি ও বসে পড়েছিল। ওর মাথাটা কোলের ওপরে রেখে ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সস্নেহে সেদিন বলে উঠেছিলাম, তোমার বয়স অল্প, ব্রাইট ইয়ংম্যান তুমি, এমন ভুলটা কর না।

চট্ করে উঠে দাঁড়াল। একটা ডাকাতের মতোই বললে, ভুল নয়—ভুল নয়। আমি তোমাকে নিয়ে যাবই।

সত্যিই একটা কাণ্ড করে ফেলল। পরের দিন দুটো ফুলের মালা নিয়ে এলো, লাল টকটকে রক্তের মতো জবা ফুলের দুটো মালা। বললে, কালীঘাটের দুটি প্রসাদী মালা।

আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বললে,—বউ!

মুহূর্তে শিরশির করে অদ্ভুৎ একটা সুখস্রোত নেমে গেল আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে,—মোহাচ্ছন্নের মতো। দুটি কম্পিত হাত তুলে আমিও বিহ্বল হয়ে পরিয়ে দিয়েছিলাম ওর গলায় সেই মালা।

সেই থেকেই আমরা স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে বাস করছি। আমি টাকা

আনছি চাকরী করে, তাই কোনো কথা ওঠে না। মানিয়েও নিয়ে চলেছি। এই ত ইতিহাস।

বলে উঠলাম, তারপর ?

—তারপরের আর কিছু নেই,—সুবালা বললে, আমি পালিয়ে আসায় বক্সী শুনেছি খুব ব্যথা পেয়েছিল। শুনলাম, বছর খানেক হল মারাও গেছে কী এক অসুখে।

বলে উঠলাম, সুখে আছ কী ?

—আবার এই প্রশ্ন ?

—না-না, আমারই ভুল হয়েছে !—বলে উঠলাম, মিস্টার ঘোষ সুখী হয়েছেন কী ?

—কে জানে !—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুবালা বললে, মানুষের মন অদ্ভুত, না ? বিশেষ করে পুরুষের মন। ইদানীং বুঝতে শুরু করেছে, আমার মন গেছে অন্যদিকে। তাই ভয়ানক দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে, কথায় কথায় রেগে ওঠে। হ্যাঁ, চড় চাপড়ও দেয়।

সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, ঠিক এই কথাটাই আমি শুনতে চাইছিলাম।

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন ?

বললাম, ভালবাসার প্রকৃতিই এই। মন হয়ে ওঠে অসাধারণ অনুভূতিশীল। তোমার মন যে চঞ্চল হয়েছে, এটা প্রত্যক্ষ তিনি ধরতে না পারলেও মনে-মনে নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন। এটা কতখানি তাঁর কাছে বেদনাদায়ক বলো ত ?

—ঈস !—মুখ ঘুরিয়ে সুবালা বলে ওঠে, পুরুষের আবার ভালবাসা !

বললাম, আর মেয়েদের ?

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, মেয়েরা ভালবাসতে জানে।

—যথা ?

—যথা ? নিজেকে দিয়ে কী টের পাও না ?

একটু থেমে তারপর বললাম, সত্যিই কী ভালবাসা ?

—যদি বলি, না। যদি বলি, ভালবাস তুমি নিশীথকে ?

চাবুক-খাওয়া মুখের মতো পাংশু হয়ে গেল ওর মুখ, কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারল না। তারপর, চোখ ছাপিয়ে দেখা দিল বাষ্পের উচ্ছ্বাস, বলে উঠল, ভুল ভুল, সব তোমাদের ভুল ! কী আছে, কী আছে ঐ নিশীথের মধ্যে !

বললাম, এতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন ? ভালবাসা কী পাপ ?

—হ্যাঁ পাপ !—সোজা হয়ে বসে তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠস্বরেই বলতে লাগল, হ্যাঁ, পাপ। তোমাকে মন দিতে পারি, কিন্তু তাকে কেন ? তুমি আমার—

বাধা দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলাম, কোন্ নাটকের সংলাপ এটা ?

'ক্রোধে অন্ধ হওয়া' বলে একটা কথা আছে। ওরও হল তাই, স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে মুহূর্তে সরে গিয়ে একটা পেপার ওয়েট হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল আমার দিকে, তারপর দরজা খুলে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বোধহয় পেপার ওয়েটটা আমার কপালে লেগে মাটিতে পড়ে গিয়ে রীতিমত শব্দসঞ্চারই করেছিল বলতে হবে, সেই শব্দে বন্ধুবরের গিয়েছিল ধ্যান ভঙ্গ হয়ে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, কী ব্যাপার হে ? শ্রীমতী রেগে চলে গেলেন।

—হ্যাঁ ভাই, বেগে প্রস্থান !—বললাম, তোমার ঘরে আইডিন-ফাইডিন কিছু আছে ?

—তা' আছে।

বাড়ীতে ফিরতে সেদিন বেশী দেরী হয়নি। আরতি আমাকে দেখামাত্রই বলে উঠলো, ওকী! কী হয়েছে?

বললাম, ও কিছু নয়। ওদের একটা দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম ত অভিনয় করে করে, তা' হঠাৎই একটা ধাক্কা লেগে গেল কাঠের একটা গুঁড়ির সঙ্গে।

—ধাক্কা লাগে কেন?

মুখ তুলে ভাল করে তাকালাম আরতির দিকে। ও বললে, একটু সাবধানে থাকতে পারো না তুমি?

মুখ ফিরিয়ে ধীর, নিম্নকণ্ঠে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, সাবধানেই থাকতে হবে এবার থেকে।

পরদিন আমাদের ওখানেই দেখা হবার কথা। কপালে তুলো লাগানো দেখে সবাই ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কী ব্যাপার?

সুবালা কিন্তু নির্বিকার। একবারও কাছে এলো না, বা কুশল প্রশ্নটুকুও করল না। কেবল যাবার সময় কাছ ঘেঁষে সবার অলক্ষ্যে হাতে কী-একটা গুঁজে দিয়ে নীরবেই চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

ফিরবার পথে ট্রামে বসে ওটা খুলে একটু পড়বার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, একটা চিঠিই। এলোমেলো ভাষায় দ্রুতহাতে লেখা।

ভাল করে পড়তে পারলাম বাড়ীতে এসে। একটা বইয়ের মধ্যে রেখে আরতিকে লুকিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগলাম। আরতি এসে বললে, —বই পড়ছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

একটু থেমে তারপর বললে, জানো?

—কী?

—পাশের বাড়ীর চাঁপা গাছটায় না, কী অদ্ভুৎ চাঁপা ফুটেছে! ফুলে ফুলে একেবারে ছেয়ে গেছে গাছের মাথাটা!

—তাই নাকি?

উৎসাহ পেয়ে একেবারে কাছে এসে বসল, বললে,—চাঁপা ফুলের গন্ধ খুব সুন্দর, না গো? সেই আগে আগে তুমি বেলফুল আর চাঁপা কিনে আনতে? আমাব কিন্তু বেলকুঁড়ির থেকে চাঁপার গন্ধই বেশী ভাল লাগে। তারপবই আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, না-না, বেলকুঁড়িও ভাল।

বললাম, বহুদিন তোমাকে এনে দিই না, না?

বললে, তাতে কী হয়েছে! তোমার সময় কই? এই অজগর সংসারের ঠ্যালা সামলাতে হচ্ছে এই দুর্দিনে। তোমার কতো চিন্তা না?

বলে একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকালো, বললে,—তোমার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, না? আচ্ছা, তুমি পড়ো। পড়া হলে বলো, ভাত বাড়বো। আমি ততক্ষণ ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখে আসি গে, হ্যাঁ?

চলে গেল। সুবালার চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই শুধু ইতি-তে আছে—তোমার সু।—কপালটার দিকে তাকানো যায়? খুব কেটে গেছে, খুব লেগেছে তোমার, না! আমার বুক ফেটে কান্না আসছে, তোমার দিকে চাইতে পারছি না, তোমার কাছেও যেতে পারছি না। কেন তুমি অমন করো? তোমার বন্ধুই বা কী মনে করলেন, বলো ত! কাল যদি দেখা না পাই ত মরে যাব। কাল সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকব। বাড়ী খালি, সবাই যাবে নিমন্ত্রণ খেতে। আসবে একবার? নিশ্চয়ই আসবে। না এলে বড়ো দুঃখ পাবো

সে রাত্রে শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত একটা চিন্তায় মন গিয়েছিল আচ্ছন্ন হয়ে।

ভাবছিলাম, দু' হাজার বছর আগে সেই সীতাবেঙ্গা পাহাড়ের হাতিপোলের রন্ধ্রপথের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেবদত্ত কী কথা বলেছিল সুতনুকার কানে কানে! হয়ত বলেছিল, বিশটি শতাব্দী পার হয়ে আমরা যখন আবার জন্ম নেবো পৃথিবীর বুকে, সেদিন তোমার কী হবে নতুন রূপ জানি না, আমার কী হবে নতুন রূপ, তা-ও জানি না। কিন্তু সেদিন কি দু'জনকে দু'জনে আমরা চিনে নিতে পারব?

জন্মান্তরবাদ কতখানি বিশ্বাস করব বলতে পারি না, কিন্তু যিনি কল্পনা করেছিলেন জন্মান্তরের, তিনি নমস্য। ভাবতে ভাল লাগে, জন্মান্তরের মানুষটিকে এজন্মে দেখেই আমরা চিনতে পারলাম। মনে মনে ভাবলাম, কে এ লোকটি? এত চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কেন? কোথায় দেখেছি একে?

মনে আছে, সুবালাকে প্রথম যেদিন দেখি, সেদিন আমার মনটাও এইরকম এক অস্থিরতায় ভরে গিয়েছিল। জনপ্রিয় এক উপন্যাসের নাট্যরূপায়ন করে শোনাচ্ছি সবাইকে আমাদের দোতলার সেই ঘরটিতে বসে। হঠাৎ-ই এক সময় চোখ পড়ল ওর দিকে। দেখি, বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে—নিষ্পলক, নিশ্চল। বোধ হয়, যোগিমারার গুহায় এমনি করেই সুতনুকা প্রথম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বারাণসীর দেবদত্তের দিকে। হয়ত প্রথম অন্তরঙ্গতার মুহূর্তে বিহ্বল কণ্ঠেই সুতনুকা বলে উঠেছিল দেবদত্তকে,—তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল, যেন জন্ম-জন্মান্তরের চেনা।

তারপরে ত কত কথাই হয়েছিল সুবালার সঙ্গে। একদিন বলেছিল, তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠপুরুষ।

আরেকদিন বলেছিল, একটা সাধ জাগে।

—কী?

কৌতুকময়ী হঠাৎ-ই হেসে উঠেছিল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বলেছিল, আরতি তোমার জীবনে না এলে তোমাকে আমি বিয়ে করতুম!

—বিয়ে!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে-হাসতে তখন ও গড়িয়ে পড়েছে বললেই চলে, বললে, মন্দ কী! তোমার রুণু ঝুনুর মা হতুম?

চুপ করে ছিলাম ওর হাসি থামা পর্যন্ত। বলেছিলাম,—কিন্তু, তারপর?

—তারপর?—ধীর, স্বপ্নিল কণ্ঠে ও বলেছিল, তুমি শুয়ে থাকবে, তোমার শিয়রে বসে তোমাকে আমি শকুন্তলা পড়ে শোনাব। কিম্বা স্বপ্ন-বাসবদত্তা!

সারাটা দিন আমাকে ঘুরতে হয়েছিল নানান কাজে। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে যখন ওর বাড়ী পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিলো নিজেই এসে, বললে, বাড়ীতে কেউ নেই, নিছক একলা।

একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বললাম, প্রিয়ার প্রথম চিঠি, যত্ন করেই তুলে রেখে এসেছি।

—সর্বনাশ! যদি কারুর হাতে পড়ে?

একটু হেসে বললাম, পড়বে না। একটা বইয়ের ভাঁজে আছে। আর তাছাড়া, আমার বইপত্র ঘাঁটার অভ্যেস আরতির বিশেষ নেই।

বললে, কাল কর্তা এসেছিল, আজ ভোরে চলে গেছে।

পরিহাস-তরলকণ্ঠে বলে উঠলাম, তাই বুঝি, স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই!

ম্লান একটু হেসে বললে, স্মৃতিই বটে। দেখবে?

—কী?

—তোমার দেওয়া সেই সঞ্চয়িতাখানা।

বলেই আলমারী থেকে নিয়ে এলো। ছিঁড়ে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলা হয়েছে। দুর্দান্ত আক্রোশে নখাঘাত করে গেছে যেন কোনো হিংস্র

শ্বাপদ। বললে, কার কাছ থেকে যেন শুনতে পেয়েছে তোমার নাম।

বললাম, এ বইখানা যে আমারই দেওয়া, তা জানল কেমন করে?

—ঐ যে প্রথম পৃষ্ঠাতেই তুমি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলে, তাই দেখে।

একটু হেসে বললাম, কী লিখেছিলাম? আমার নামও না, তোমার নামও না। শুধু পৃষ্ঠাটির ওপরে এক কোণে ছোট করে লিখে দিয়েছিলাম একটি কথা 'তোমাকে।'

স্নিগ্ধ দুটি চোখ মেলে তাকালো, বলল, মাত্র তিনটি অক্ষরে তুমি যে সব কথাই লিখে দিয়েছিলে গো! কেন যে এত ভালবাসলে, তা তুমিই জানো।

বলেই মাথা নীচু করে দুটি হাতে ঢাকল মুখ, বললে, সেই দুপুর থেকে একা আছি। না থাকাই বোধ হয় ভাল ছিল।

একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম,—কেন?

কেমন যেন ধরা ধরা গলায় উত্তর দিলো, My eyes are seldom dry when I am alone!

একটুক্ষণ থেমে অল্প একটু হেসে বললাম, ইসাডোরা ডানকান?

—হ্যাঁ।

চুপচাপ কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। এক সময় উঠে গিয়ে ভিতর থেকে কী সব খাবার-টাবার নিয়ে এলো, সে সব আমার খাওয়াও হয়ে গেল নীরবে। বললাম, এবার উঠি?

কী অদ্ভুৎ ভারী ওর কণ্ঠস্বর, বললে,—শোনো? প্রত্যেক মেয়েই চায় নীড় বাঁধতে। আমিও চেয়েছিলাম আমার বয়ঃসন্ধিকালে। কিন্তু পাইনি।

নিরুত্তরেই উঠে দাঁড়ালাম, ও পিছন থেকে ডেকে বললে, তাই ঘোষ যখন সত্যিই আমাকে দিল নীড় বেঁধে, মনে হল আকাশের চাঁদ

পেলাম হাতে। শাশুড়ী যখন বৌমা বলে ডাকেন, দেওর-ননদ যখন ডাকে বৌদি বলে, তখন আজও আমার শরীর-মনে একটা অজানিত সুখের শিহরণ বয়ে যায়।

বলতে বলতে হঠাৎই আমার হাতটা চেপে ধরলে, বলল, কিন্তু এঘর যদি আমার ভেঙে যায়?

ধীর, অকম্পিত কণ্ঠেই বললাম, ভাঙবে কেন?

চাপা ফিস-ফিস-করা সুরেই বললে, কী করে সত্যি কথাটা তোমাকে বলি? মন যে তবু ভরে না। ও প্রায় আমারই সমবয়সী। উদ্দাম ওর যৌবন। সেটা আমাকে অভিভূত করে—কিন্তু……

—কিন্তু?

একটু থেমে তেমনি ভারী গলায় বলে উঠলো, কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁকী রয়ে গেছে! আমি মুখ বুজে সব সহ্য করি—হাহাকার করে মন—তবু আঁকড়ে ধরে আছি আমার নীড়টুকুকে। এ যদি যায় ত কী আমার থাকবে?

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। হাতে একটু নাড়া দিয়ে বললে, কী, কথা বলছ না যে?

ধীর গম্ভীর কণ্ঠেই বললাম, তাই কর। প্রাণপণে আঁকড়ে ধর এই নীড়টুকু। এ গেলে সত্যিই তোমার আর কিছু থাকবে না।

আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালো। বললে, তার অর্থ কী জানো? স-ব আমাকে ছাড়তে হবে।

—ছাড়বে।

—এমনকি, হয়ত তোমাকেও।

—দরকার হলে তা-ও ছাড়বে।

আমার মুখের দিকে তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, বললে, তোমার কষ্ট হবে না?

—না।

সুকঠিন প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সুবালা। আমি ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম পথে। দিনশেষের এই ক্লান্ত সন্ধ্যায় যে কথা ওর মুখে শুনতে আজ বড় ইচ্ছা করছিল সারাক্ষণ, পথ হাঁটতে হাঁটতে এখন মনে হচ্ছে, সে কথা না বলে ও ভালই করেছে।

—কেমন আছে তোমার কপালের সেই ব্যথাটা?—এ কথা শুনলে হয়ত খুশী হতো আমার প্রেমিক মন, কিন্তু, ভাবুক মন আজ যা পেলো, তা কি সে পেতো কোনোদিন?

সদর তখনো বন্ধ হয়নি, ভেজানো কবাট ঠেলে উঠোন পার হয়ে আমাদের ঘরে এলাম। ঝুনু ঘুমোচ্ছে অঘোরে, রুণুর চোখে তখনো ঘুম নামেনি। বললাম, তোর মা কোথায় রে?

—ছাদে।

—এত রাত্রে ছাদে কেন!

কাপড়চোপড় বদলে টেবিলের কাছে আসতে আসতে একটা জিনিস চোখে পড়তেই অতর্কিত বিস্ময়ে আর আতঙ্কে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি, টেবিলের ওপরে সুবালার সেই চিঠিটা খোলা পড়ে রয়েছে, একটা কাঁচের দোয়াত চাপা দেওয়া।

মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম সব। কোন বইয়ের ভাঁজে যেন রেখে-'ছিলাম চিঠিটা, কী ভাবে যেন পড়ে গেছে আরতির হাতে!

বেশ কিছুটা সময় গেল, নিজেকে সহজ করে নিতে। তার পরে তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম ছাদে। সমস্ত ছাদ জুড়ে আর কেউই নেই, এককোণে ছায়ামূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আরতি।

বললাম, কতোক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছ এখানে, নিচে যাবে না?

খুব আস্তে, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠেই উত্তর দিল,—চলো।

ছায়ামূর্তি অপস্রিয়মান হবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, একটু দাঁড়াও।

দাঁড়ালো।

বললাম, জানি, কী হয়েছে। জানি, কী তুমি ভেবেছো চিঠিটা পড়ে। কিন্তু কী আমি করতে পারি? ভুল ত মানুষেরই হয়।

মৃদু, অকম্পিত কণ্ঠে বললে, ভুল কেন হবে!

—ভুল নয়! বলে উঠলাম!—কিন্তু বিশ্বাস কর, আর আমার ভুল হবে না।

দুটি স্থির দৃষ্টি আমার ওপর স্থাপিত করে বললে, দুঃখ আমার সেখানে নয়। দুঃখ এই, আমার কাছ থেকে সব-কিছু লুকোলে কেন তুমি?

—কী লুকিয়েছি!

—তুমিই জানো।

বলেই আর দাঁড়ালো না, দ্রুত পদক্ষেপে ছাদ পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল আরতি।

রাত যখন নিঃঝুম হয়ে গেল, ঘুমিয়ে পড়ল রুণু, ঘুমিয়ে পড়ল আশে-পাশের সব, তখন বললাম, লুকোবার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি সুবালার সঙ্গে, বিশ্বাস কর।

আরতি বললে, কিন্তু সেজন্য ত আমার কোনো দুঃখ নেই! আমি তোমার যোগ্য নই, সে আমি জানি।

মনে মনে অবাক হচ্ছিলাম, আরতির ভিন্নতর একটি রূপ দেখে। সহজ, সরল, নরম একটি নারীমন, কিন্তু তার ভিতরেও যে দৃঢ়, ঋজু কঠিন একটি মেয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, এটা আজ আমার কাছেও আবিষ্কার বলতে হবে।

ভেবেছিলাম, জানাজানি কোনোদিন যদি হয়ই, ও হয়ত ভেঙে

পড়বে, কেঁদে ভাসাবে বুক। কিন্তু সেসব কিছু হল না, যেটা হল সেটা ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত করে তুললো আমাকে। ওর পাশে শুয়ে চুপচাপ কেটে গেল আমার বিনিদ্র রাত্রি, ওর ঘুমের কিন্তু কোনো ব্যাঘাত ঘটলো না।

এরপরের কয়েকটা দিন নানান্ কাজেব ভীড়ে ডুবিয়ে রাখলাম নিজেকে। এমন কি থিয়েটারের তারিখে পর-পব দুটো দিন থিয়েটারেও গেলাম না। আরতি কাছে আসে, কথাও বলে, কিন্তু এ যেন অন্য এক মানুষ!

ওর অটল গাম্ভীর্য ভাঙবার জন্যই একদিন বললাম, কাল বেরোবো না, যাবে আমার সঙ্গে কোনো গাঁয়ের দিকে বেড়াতে?

আরতি মুখ নিচু করে থাকে নিরুত্তরে।

সোৎসাহে বলে উঠি, চলো, কোথাও কোনো গাঁয়ের পুকুরে সাদা-সাদা শালুক-ফুল ফুটে আছে কি না দেখে আসি!

সংক্ষেপে উত্তর দেয়, না।

এবং তারপরেই কাছ থেকে উঠে চলে যায়।

মনটা হু-হু করে বই কী মাঝে মাঝে! এক-একবার মনে হয়, বারাণসীর দেবদত্তের কি স্ত্রী ছিল? ছিল কি সেই দু'হাজার বছর আগের বারাণসীতে এমন কোনো কন্যা যে রূপদক্ষ দেবদত্তকে মনে-মনে ভাল-বেসেছিল, বিবাহও করেছিল তাকে? অভিনয়-অনুষ্ঠানের শেষে শূন্য দর্শকমণ্ডলীর আসনশ্রেণীর এক প্রান্তে বসে হয়ত তার দয়িতের কণ্ঠলগ্না হয়ে একদিন চুপি চুপি এই প্রশ্নই তাকে করেছিল দেবদাসী সুতনুকা,— হঠাৎ কেন তুমি বিয়ে করতে গেলে দেবদত্ত?

হয়ত সেই নির্জন নিস্তব্ধ তিমিরাবৃত রাত্রের অবকাশে দেবদত্ত

উদ্ঘাটিত করেছিল তার অন্তরের রহস্য, বলেছিল, এ এক আশ্চর্য ঘটনা সুতনুকা, এর জন্য আমিই দায়ী।

তারপরে, স্বপ্নমুগ্ধ দুটি চোখ ওর চোখে স্থাপিত করে যোগিমারার শিলাতলে বসে দেবদত্ত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে হয়ত বলেছিল, কেন আমি রূপদক্ষ হলাম, বলতে পারো? কেন শিল্পী মন নিয়ে জন্মালাম পৃথিবীতে?

দুটি মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হয়ত সুতনুকাও বলেছিল, একী কোনো অভিযোগ করার কথা? তোমার অপরূপ গভীর দুটি চোখের দৃষ্টিই বলে দেয়, কতো স্নেহপ্রবণ তুমি, কতো দরদী তোমার মন!

হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দেবদত্ত বলেছিল, বারাণসীর সেই কন্যা যেদিন পণ করে বসল, আমাকে ছাড়া কাউকে সে বিয়ে করবে না, সেদিন আমার এই দরদী শিল্পীমনই সহানুভূতি আর স্নেহে উঠেছিল কোমল হয়ে।

—তাই বুঝি বিয়ে করলে?

—হ্যাঁ। কিন্তু তাও পাঁচবছর অপেক্ষা করার পর। বারাণসীর সেই কন্যা পাঁচবছর সমানে তপস্যা করেছিল আমার জন্য।

অল্প একটু হেসে সুতনুকা হয়ত বলেছিল, আজ আবার সেই কন্যার কাছেই ফিরে যাওনা কেন?

—দেহটা ফিরলেও মন যে ফিরবে না।

—কী করে জানলে?

—কী আশ্চর্য, আমি জানি না আমার মন!

—অতো সহজে মানুষ যদি নিজেকে জানতে পারত, ত, ব[illegible] সমাধান সহজেই হয়ে যেতো। তুমি যদি বেশ কিছুদিন আমা[illegible]কে দূরে থাকো ত, দেখবে, তুমি আমাকে ভুলে গেছো!

—বলছ কী তুমি?

সুতনুকা অদ্ভুত শান্ত আর সহজ গলায় বলেছিল, ঠিকই বলছি। বহুদিনের অদর্শন প্রেম-প্রবাহিনীর বক্ষদেশে বালুচরের ব্যবধি জাগিয়ে তোলে, জানো না ?

থিয়েটারে যেতেই প্রণবেশ তরলকণ্ঠে বললে, এই যে! Give me my Romeo and when he shall die, take him and cut him out in little stars! কিন্তু কী করেছ চেহারাখানা! ঝড়োকাক একেবারে!

বললাম, ভালো খবর ত সব ?

বাঁকা একটু হেসে বললে, খবব ত সব তোমার কাছে। তুমি একবারটি স্টেজে যাও, আমি বুকিং থেকে একটু ঘুরে আসছি!

ভিতরে যেতেই কলরব করে উঠল অঞ্জলি। কালোপাড় সাদা একটা শাড়ী পরে, মাথার চুলের ছুপাশে ছুটি একটি সাদা রঙের আঁচড় টেনে, কপালে চোখের নীচে আর চিবুকে কালো পেন্সিলের কয়েকটি রেখা টেনে প্রৌঢ়া মা সেজেছে সে। আমি যখন কাছে গেলাম, পিয়ানোর কাছে-বসে-থাকা যতীনবাবুর খালি কাঁচের শিশিটায় কিছু সুপরি-লবঙ্গ ভর্তি করে দিচ্ছিল সে নিজের রূপোলী পানের ডিবে থেকে, এটা সে প্রায়ই দেয়। বললে, কী ব্যাপার! ছু'জনেই যে একসঙ্গে হাওয়া একেবারে!

আশ্চর্য হয়ে বললাম, ছুজনে! ছুজনে মানে ?

যতীনবাবুর ম্যাক্রোপোলোয় ঘনঘন টান পড়তে লাগল। পুঞ্জ পুঞ্জ সূক্ষ্ম ধোঁয়ায় ঢেকে গেল যতীনবাবুর মুখের ভাব। অঞ্জলি বললে, সুবালাও আসেনি ছুদিন, আপনিও না। আজ আপনি এলেন, কিন্তু সে আজও আসেনি। তিন দিন কামাই। আমরা হলে চাকরীই চলে যেতো, সুবালা বলেই কিছু হল না। প্রণবেশদা দিব্যি কাজলকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।

তারপরেই মুখ টিপে হেসে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন হু'জনে? বাইরে?

নির্বাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। যেন কথা নয়, কতোগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টি আমার কর্ণে প্রবেশ করছে।

অঞ্জলি কী ভেবে আমার হাত ধরে একান্তে টেনে নিয়ে গেল। মায়ের মতো স্নেহমণ্ডিত কণ্ঠেই বলে উঠলো, সিফ্‌টার থেকে সুরু করে সবাই যে আপনাকে দেখে মুচ্‌কি হাসছে, বুঝতে পারছেন না! বড়ো ছেলে-মানুষ আপনি, কাজের দিনে কখনো একসঙ্গে কামাই করে। লোকে ত কানাকানি করবেই! এসব করতে হয় ছুটির দিনে। সেটুকুও বুদ্ধি ঘটে নেই!

—এসব তোমরা কী বলছ অঞ্জলি?

মায়ের মতোই স্নেহঝরা হাসির আভায় ভরে গেল ওর মুখ, বললে, আমার কাছে লুকোতে নেই, আমি সব জানি!

ইতিমধ্যে জুতো মসমসিয়ে প্রণবেশ এসে খুঁজে বার করেছে আমাকে, বললে, এই যে। ওপরে চলো। অনেক কথা আছে।

বন্ধ ঘরের নিভৃতিতে এসে ও হাতের সিগারেটটা জুতোর তলায় পিষে ফেলে পায়চারী করতে করতে বললে, মালিকদের ছোট ছেলে আজকাল কাজে খুব ইনটারেস্ট নিচ্ছেন।

—কে? সুশীলবাবু?

—হ্যাঁ। দেখ গিয়ে, বক্সে আছেন বসে।

—থিয়েটার দেখছেন?

—তা দেখছেন। সুবালার অনুপস্থিতিতে কাজলকে নামিয়েছি ত, তাই লক্ষ্য করছেন কাজলের কাজ।

বললাম, আমারও ত দেখা দরকার তাহলে?

—থাক!—প্রণবেশ বললে, সুবালার আর কাজলের অনেক

তফাৎ, ও তুমি না দেখেও বুঝতে পারবে। কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে এই বন্ধু, সুশীলবাবু বয়সে ছেলেমানুষ হতে পারেন কিন্তু তাঁর মতামত আবার যেন উপেক্ষার চোখে দেখো না।

অল্প একটু হেসে বললাম, এই কথা বলবার জন্য ধরে নিয়ে এলে?

—না। প্রণবেশ পায়চারী থামিয়ে বললে, সুবালা এই যে কাজটা করেছে, এর জন্য আমি একটুও মনে কিছু করিনি। কিন্তু কাল থেকে সে যেন নিয়মিত আসে, এটুকু তাকে বলে দিও।

কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলেই বলে উঠলাম, কিন্তু সেকথা আমাকে বলছ কেন?

—তোমাকে বলছি কেন, তার মানে?—প্রণবেশ বললে, বোধ হয় দারোয়ানটাও জানে, দু'দিন সুবালাকে নিয়ে তুমি উধাও হয়ে গিয়েছিলে কোথাও।

—বলছ কী তুমি!

বাঁকা একটু হেসে প্রণবেশ বললে, থাক, আমার কাছে ঢাকবার চেষ্টা করো না। আসল কথা, আমিও খুশি হয়েছি। কারণ আমিই তোমাকে বলেছিলাম, নিশীথকে তাড়াতে ওর কাছ থেকে। কিন্তু বন্ধু আর নয়, To you, Juliet is dead.

বুঝলাম, একে সব কিছু খুলে বলতে যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথাই হবে। কিন্তু বিচিত্র এই পাদপ্রদীপের জগৎ! দুটি লোক অনুপস্থিত তাই সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিয়ে একটা বিশ্রী ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল সবার মধ্যে। বললাম, আচ্ছা এই যে নিশীথ নিশীথ করছ, কোনদিন কি ভেবে দেখেছ নিশীথ আর ওর মধ্যে কোনো ভালোবাসার সম্বন্ধ না-ও গড়ে উঠে থাকতে পারে।

দুটি চোখ যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠল প্রণবেশের। বললে, তোমাদের ঐ সব প্লেটোনিক লভ্ অথবা তারা মৈত্রী-টৈত্রী ঝি না! দুটি পুরুষ

আর নারী পরস্পরের সঙ্গ পেতে চায়, একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, আর সুযোগ পেলেই অন্তরঙ্গ হয়, এই-ই ত বুঝি। নিশীথ আর সুবালারও তাই হয়েছিল। দেখবে প্রমাণ?

—প্রমাণ?

অল্প একটু হেসে বললে, সামান্য একটু গোয়েন্দাগিরি করতে হয়েছিল। এ দু'দিন সুবালা ত আসেনি, নিশীথের অবস্থা একেবারে শোচনীয়! কোথায় কী রাখে, কাকে কী বলে কিছুই ঠিক ছিল না। ওপরের ঘরে হারমোনিয়ামের বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেছে তাই চিঠিটা। আমিই পেয়েছি। দরকার হলে মালিকদের দেখাবো, তবে এখন নয়। শুধু তুমি একবার দেখে রাখো।

বলে পকেট থেকে বার করল চিঠিটা। আমার হাতে দিয়ে বলতে লাগল, নতুন একটা গানের ছেলে নিয়েছি অসিত। তাকে তৈরী করি, তারপরে দেখব কেমন করে তাড়াতে হয় নিশীথকে।

ততক্ষণে পড়তে শুরু করেছি চিঠিটা। সুবালারই হাতের লেখা, তাতে কোনো ভুল নেই। লিখেছে—ওগো, সব যে জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। তুমি যখন সুরের মধ্যে ডুবে যাও তখন তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভুলে যাই বিশ্বসংসার! আমাকে 'বিদ্যা' বলে যখন তুমি ডাকো আমার ভিতরটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওগো আমার সুন্দর, আমি তোমার সেই গোপালবাবুর গানের কথাতেই তোমাকে বলি, প্রেম গোপনে রাখতে পারিনে, মজেছি না জেনে কি করি বলো সজনী। লোকে করে কানাকানি হলো লোক জানাজানি অপমান সহে প্রাণ,—তাঁরে দিনান্তে না দেখলে প্রাণে বাঁচিনে।—কবে দেখা হবে আবার! ইতি—'বিদ্যা'।

বোধহয় বহুক্ষণ কথা বলতে পারিনি, নিজেকে চেয়ারের গায়ে এলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মতো বসেছিলাম। প্রণবেশ নিরন্তরে পায়চারী করছিল ঘরের মধ্যে। একসময় কাছে এসে বললে, কী ভাবছ?

—কিছু না।

—ভাবতে পেরেছিলে এতটা ?

—না।

হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা পায়ের নিচে ঘষে ঘষে নিভিয়ে ফেলে তারপরে বললে, অবশ্য নিশীথকে আমি চিনি, ও ভেঙে পড়বার ছেলেই নয়। দু'দিন থাকবে একটু বিমর্ষভাব, তারপরেই সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। ওর কাছে সু আর কু কিছু নয়, যে কোনো বালা হলেই হল। সুযোগ আর সুবিধা মতো সবাইকেই ও 'বিস্তা' করে তুলতে পারে।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, নিশীথেব সঙ্গে একবার দেখা করব।

প্রণবেশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ নির্বাক থেকে তারপর বললো, তা করো। কিন্তু, আব যেন জুলিয়েটের ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে রোমিও হয়ো না।

অল্প একটু হেসে বললাম, রোমিও-জুলিয়েট তোমাকে পেয়ে বসেছে দেখছি !

হেসে উঠল হো-হো করে, বলল, ছোটো থেকেই সাধ, বড়ো হয়ে রোমিও-জুলিয়েট অভিনয় করব, আমি হবো বোমিও। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা আমাকে রোমিও না কবে শেষ পর্যন্ত করলেন বোমিওদের মাস্টার। দেখ না, নিজে মুখে রঙ না মেখে রঙ-মাখাদের ম্যানেজার হয়ে বসে আছি। একবার মালিক, একবার স্টেজ, একবার তুমি, একবার বুকিং, একবার নিশীথ-সুবালাদের দল—এই করে বেড়াচ্ছি আর কী !

অশথ-শিশুদের-শিকড়-বিস্তার-করা একটা ইটের-কঙ্কাল-বার-হওয়া একতলা বাড়ীর চিলেকোঠার স্বল্প বিস্তারের মধ্যে বাস করে, নিশীথকুমার আর হারমনিয়ামটা নিয়ে। কাজকর্ম সেরে মুখের রঙ মুছে ফেলে একেবারে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওর বাড়ীতে। চিলেকোঠার দরজাটা খুলে

দিলো নিশীথ, বললে, সবাই বলে সুবালাকে আপনি ভালবাসেন। কিন্তু ও তা কখনো স্বীকার করে না।

ও যে বিনা ভূমিকায় একেবারে সরাসরি এ প্রসঙ্গে চলে আসবে এতটা আমি ভাবতে পারিনি, ববং এতে আমি সেই মুহূর্তে নিজেই একটু সংকুচিত বোধ করছিলাম, বললাম, তোমার স্ত্রীপুত্র কোথায় নিশীথ?

বললে, আপাততঃ বাপের বাড়ীতে। থাকলেও নিচেই সব সংসারের কলরব। ওপরের এই ঘরখানা আমার নিজস্ব। আমি আর আমার সুর। কিন্তু যা বলছিলাম, সুবালা আপনার সম্বন্ধে কী বলে জানেন?

—কী?

—বলে, আপনার সঙ্গে ওর গুরু শিষ্যার সম্বন্ধ। বলে, সব কিছুই নাকি লোকের বাজে রটনা!

একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ করে তারপরে কণ্ঠে জোর এনে বলে উঠলাম, সুবালা মিথ্যে বলেনি নিশীথ।

যেন গুরুভার নেমে গেল ওর বুক থেকে, এমনি নিশ্চিন্ত, এমনি লঘু হয়ে গেল ওর মন, বিনির্মল একটা হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ।—শুনবেন দাদা আমার কথা?

—কী কথা? কণ্ঠস্বর আমার একবারও কাঁপল না,—সুবালাকে ভালবেসেছো এই ত?

ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, দেখা হয় না ক'দিন?

—তা দিন চার-পাঁচ।

মনে মনে একটু অবাকই হচ্ছিলাম। কাজেও আসেনি, আমার বা নিশীথের সঙ্গেও দেখা হয়নি, এ কয়দিন ও করল কী? অসুখ বিসুখ হয়নি ত? বললাম, কখনো গেছো সুবালার বাড়ী?

—না। নিশীথ বললে, যাওয়া বারণ। বাড়ীর লোকজন যদি কেউ দেখে ফেলে!

—ও এসেছে কখনো তোমার বাড়ী?

সলজ্জ একটু হেসে বললে, হ্যাঁ তা এসেছে। আমার এই ঘরে। বলে, ঘরের চারিদিকে কোমল একটি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে, কতো গান শুনে গেছে এই ঘরে বসে!

—তোমার বাড়ীর লোকে আপত্তি করেননি?

মুহূর্তে একটা কালো ছায়া যেন খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে, বললে, বাড়ীব লোকেব ত অনেক ব্যাপারেই আপত্তি! কিন্তু, শুনছে কে?

ধীরে ধীরে টেনে নিলো হারমনিয়ামটা, বললে, শুনবেন দাদা, একটা গান?

পরিহাসতরল কণ্ঠে বললাম, কী গান? বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি?

লজ্জিত হল একটু, বললে, এইসব পুরানো গান আমায় পেয়ে বসেছে।

বললাম, তা সে তোমার বিদ্যাকেই শুনিও।

সলজ্জ একটু হেসে বললে, তাকে এখন পাচ্ছি কোথায়?

একবার মনে হল চীৎকার করে ওকে বলে উঠি, ভুল, সব তোমার ভুল! সুবালার সঙ্গে আমাব যা সম্পর্ক, তা ভালবাসারই সম্পর্ক। তোমার সঙ্গে ও লীলা করছে নিশীথ! তুমি আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও। কিন্তু কোথায় আমার সেই শক্তি! মনে হল, কোন্ ভিত্তিভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে আমি উচ্চারণ করতে পারি এ কথা? কতটুকু হবে তার সত্য?

নিশীথ ততক্ষণে গানের বাণীতে মগ্ন হয়ে গেছে, বললে, 'যেমনে ভুলালে আমার মন। এখন কৈ সে তেমন। নয়নে হেরেছি যারে, অন্তরে না হেরি তারে, এখন তাহারি তরে দহিছে জীবন।'

'দহিছে জীবন' কথাটার ওপরে বারেবারে মীড়ের মোচড় দিয়ে সুর বিস্তার করতে লাগল নিশীথ। তারপরে একসময় হঠাৎ-ই হারমনিয়াম থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, অভিশাপ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার স্ত্রী চলে গেছে বাপের বাড়ীতে। কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন ত?

শিউরে উঠলাম ভিতরে ভিতরে। এ অভিশাপ যদি স্পর্শ করে সুবালাকে! হয়ত এতক্ষণে আমার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তেজনাই জেগে উঠল, বললাম, ও যে বিবাহিতা, তা তুমি জানো?

—জানি। সব ও বলেছে।

—কী বলেছে?

আমার মুখের দিকে তাকালো নিশীথ। বলল, একটুও বনিবনা নেই। শীগগিরই ও ডাইভোর্স করবে।

—করে?

নিশীথ অকম্পিত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, একসঙ্গে থাকবো আমরা।

—স্ত্রী-পুত্র?

দুহাতে নিজের চুলের মুঠি আকড়ে ধরে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত কোনো নিঃসহায়ের মতো বলে উঠল, জানি না। আমি আর ভাবতেও পারছি না কিছু!

সেই রাত্রে পিচের কালো সর্পিল পথ বেয়ে ক্রমাগত চলেছিলাম মনে আছে। ট্রাম-বাসের আলো, জনতার সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি বসা বা দাঁড়ানো, এ চিন্তাটাই কেন যেন আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিলো সেদিন। তাই ধাবমান জনতাকে পাশ কাটিয়েই চলবার চেষ্টা করছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে সোজা এসপ্লানেড। সেখান থেকে ময়দানের ফাঁকা পথ দিয়ে আবার হাঁটতে হাঁটতে একেবারে দক্ষিণাভিমুখী আমাদের বাড়ী।

মনে হচ্ছিল, আজ থেকে দু' হাজার বছর আগের সেই সীতাবেঙ্গা-যোগিমারার গুহাদেশে যেন প্রচণ্ড ভূকম্পন হচ্ছে। বীণকার সুর-গন্ধর্বের সুকঠিন বাহুবন্ধনের মধ্যে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সুতনুকা। আর, চারদিকের পাষাণস্তূপ অমিত শক্তিতে টেনে, গুঁড়িয়ে ফেলে প্রমত্তের মতো হুঙ্কার করছে বারানসীর দেবদত্ত। বলছে, চুরমার হয়ে যাক তোমাদের গুহাবাস! চিরতরে নিভে যাক তোমাদের দীপবর্তিকার উজ্জ্বল শিখা! অজস্র খেচর-ভূচরে ভরে যাক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! মানুষ নামধারী পশু-বিশেষ নিঃশেষে মুছে যাক অরণ্য-গিরিমাল্যশোভিত এই ধরিত্রীর ধূলিকণা থেকে!

কিন্তু, সব কিছুরই ত একটা সমাপ্তি আছে! প্রবল ঝঞ্ঝাও এক সময় থেমে যায়। শান্ত হয়ে যায় জনপদ-বিধ্বংসা ভূমিকম্পনও। সব কিছু ধীর হয়ে স্থির হয়ে যায় আবার। আবার মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ দেখা দেয়, আবার দেখা দেয় সারি সারি নক্ষত্রপুঞ্জ। দেখা দেয় সপ্তর্ষি-মণ্ডল, দেখা দেয় কালপুরুষ। শুধু, যা ভেঙে-চুরে যাবার, তা ভেঙে খানখান হয়ে যায় ইতিমধ্যে। সীতাবেঙ্গা পাহাড়ের সেই হাতিপোলের নিভৃতিও বুঝি চুরমার হয়ে গেছে। আর, তমসাবৃতা রহস্যময়ী রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে সেখানে এসে দাঁড়াবে না দুটি ছায়ামূর্তি! আব তেমন করে স্বপ্নময় দুটি চোখ তাকাবে না দুটি মুগ্ধ চোখের দিকে! আবেশজড়িত একটি কণ্ঠস্বর আর খুঁজবে না তেমন কবে আরেকটি কণ্ঠস্বরকে, আর বলবে না একজন আরেকজনকে, আমার মধ্যে এতো কী দেখ তুমি দেবদত্ত?

—অরূপকে দেখতে পাই রূপের মধ্যে!

মুহূর্তে শিউরে উঠে ওর প্রশস্ত বক্ষে মুখ লুকিয়ে ফেলে সুতনুকা, বলে, অমন করে বলো না, গো বলো না! বড়ো ভয় করে।

দুটি আতপ্ত ওষ্ঠের আশ্লেষ হাওয়ায়-ওড়া কেশ-অরণ্যের মধ্যে স্থাপিত করে বলে ওঠে দেবদত্ত, কেন?

উত্তর দেয় কান্নাভরা একটি কণ্ঠ, দেহলাবণ্য ধূপের মতো পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে প্রহরে প্রহরে। যেদিন শেষ হয়ে যাবো, সেদিন দেবতার পদমূলে পড়ে থাকবে সামান্য কিছু ভস্ম মাত্র। সেদিন কী হবে?

—সেদিন সেই ভস্মের টিকা উঠবে দেবতার ললাট-প্রদেশে! রূপের বিবর্তন আছে, ক্ষয় নেই। রূপ জেগে থাকে রূপান্তরের মধ্যে!

তখনো কম্পিত হচ্ছে সুতনুকার কণ্ঠস্বর, যদি চিনতে না পারি সেই রূপান্তর?

অমোঘ এক অভয়বাণী জেগে ওঠে রূপদক্ষের কণ্ঠে, চিনিয়ে দেবার জন্য থাকব আমরা। যুগে যুগে আমরা দুজনে দুজনকে চিনে নেবো। দূর থেকে হঠাৎ একদিন দেখতে পাবো দুজনকে দুজনে, নীরব প্রশ্ন জাগবে দুজনের মনে—কে ও? এতো পরিচিত মনে হচ্ছে কেন ওকে? ওকে দেখে এমন ভাবে কম্পিত হচ্ছে কেন অন্তরের অন্তঃস্থল!

কিন্তু, হায় হায় করে ফিরছে গুহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তামসিনী রাত্রির দিশাহারা বাতাস,—আর ফিরে আসবে না সেই সব মধুসঞ্চারী বিহ্বল মুহূর্ত! বীণকার সুর-গন্ধর্বের বাহু-নিষ্পেষণে চুরমার হয়ে গেছে—নিঃশেষে হারিয়ে গেছে স্বপ্নময়ী সুতনুকা।

সীতাবেঙ্গার বন্ধুর পার্বত্য-পথে একাই তাই ঘুরে মরে রূপদক্ষ দেবদত্ত,—কতো চঞ্চলার কলধ্বনি শোনা যায় পথের প্রান্তে প্রান্তে, কতো চপলচরণার নূপুরশিঞ্জন বেজে ওঠে গুহামণ্ডপের কোণে-কোণে, কতো রাগিনীর তন্ময় লয়স্রোত জাগে গুহাকক্ষের মধ্য থেকে। দেবদত্তর হৃদয়ের তন্ত্রে-তন্ত্রে বেজে ওঠে না কোনো সুর, শুধু ফেনিল নীল বেদনার স্রোত স্মৃতির উপলখণ্ডে-খণ্ডে ঝর্ণাধারার মতো ভেঙে-ভেঙে পড়ে। তাই, গুহার মধ্যে, অন্তরাল খুঁজে নিয়ে সহস্র কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসে হৃদয়ের সবটুকু ব্যথার অমৃত উজাড় করে পাষাণ কেটে কেটে

রূপদক্ষ রচনা করে চলে তার জীবনবেদ—সুতনুকাকে ভালবেসেছিল দেবদত্ত। সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি—

নিস্প্রাণ এক পুত্তলিকার মতোই দরজা খুলে দেয় আরতি, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতোই পরিচর্যা করে যায়। প্রথম তন্দ্রার ঘোর কেটে গিয়ে যখন আবার জেগে উঠি যখন আর বাকীটা রাত কিছুতেই চোখে নেমে আসে না ঘুম, তখন হয়ত বা ক্লিষ্ট কণ্ঠে এক-একবার ডেকে উঠি, ওগো!

নিদ্রিত রুণু আর ঝুনুর আড়ালে বিছানার একপাশে গভীর ঘুমে ডুবে আছে আরতি, কোন গহীন প্রসুপ্তির রাজ্যে তার মন তখন অবগাহন করছে কে জানে!

হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে ইচ্ছা হল তাক থেকে কোনো বই টেনে নিয়ে পড়ি, কিন্তু, থাক, আলো চোখে লেগে ওর ঘুম যদি ভেঙে যায়!

জানালা থেকে একফালি পাণ্ডুর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ওর ঘুমন্ত মুখখানার ওপরে। দেখতে দেখতে অদ্ভুৎ একটা স্নেহ আর করুণায় ভরে উঠল মন। সব থেকে বশী বাজল এই কথা ভেবে যে ওর সমস্ত ছেলে-মানুষী, উচ্ছলতা আর প্রাণচাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। দুজনেই পিতা ও মাতার ভূমিকা যথাযথ পালন করে চলেছি। আমার দিকে সংসার-পরিচালনায় যেমন কোনো ত্রুটি নেই, ওর নেই ত্রুটি কর্তব্য-পালনে। এমন কি রাত্রে উঠে জল খাই বলে টেবিলের ওপরে কাঁচের গ্লাসে ঠাণ্ডা কুঁজোর জল ভরে রাখতেও ভুল হয়নি ওর।

কিন্তু কিছু করবার নেই আমার দিক থেকেও। ওর মনের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এমন এক চিন্তাধারার খরস্রোত প্রবহমান, যা আমার সহস্র সান্ত্বনা, সহস্র স্নেহবাণীতেও মুছে যাবে না। এ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। ও যখন নিজেই নিজের অনুভূতির মধ্য দিয়ে সব-কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে সেদিনই কেটে যাবে ওর অভিমানী দৃষ্টিকে আবরিত

কন্না সমস্ত কুয়াশা। তার আগে কোনো কিছুই ঘুচে যাবার নয়; আমার শত চেষ্টাতেও নয়।

অথচ, আমার মন চাইছে, এই ব্যথা-নিবিড় মুহূর্তে কেউ আমার কাছে আসুক। এসে কোমল কণ্ঠে সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করুক, কী হয়েছে তোমার গো?

কিন্তু কে আনবে বুকভরা এই সহানুভূতি! ক্ষমা, দয়া আর করুণার মধু কার বক্ষে আছে সঞ্চিত হয়ে! হয়ত আরতিই একদিন পারবে, কিন্তু তার জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে আমাকে, দিতে হবে তাকে তার নিজের মনটাকে স্থিতধী করবার অবকাশ! তাকে আমি বলতে পারতাম, কী অপরাধ আমি করেছি তোমার কাছে?

কিন্তু এতে আমার দিক থেকে এক এক হীনতার প্রকাশ ছিল, যা তার মতো মেয়েকে ক্লিষ্ট করত। কঠোর কণ্ঠে তাকে রূঢ় কথা বলতেও পারতাম, কিন্তু তাতে যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেতো, তা লক্ষ্য করে অশ্রদ্ধায় ভরে উঠতো ওর মতো মেয়ের মন। ওর মন এখন যা অধিকার করে আছে, তা হচ্ছে—অভিমান, রুদ্ধ, অন্ধ দুর্জয় এক অভিমান।

এরপর বেশ কয়েকটা দিন 'পাদপ্রদীপ' থেকে নিজেকে আমি দূরে রেখেছিলাম। যেন কয়েকটা দিনের ছুটি পরিচিত জগৎ থেকে। তারপর আবার সেই একই গান, একই কথা, একই হাসি। ওমরের সেই পান্থশালার মতো। দিন যায়, প্রহর যায়, যায় দণ্ড-পল-অনুপল, তবু সরাইখানায় পথিকদলের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই! তারই মধ্যে তন্বঙ্গী সাকী তার সেই বিচিত্র হাসি আর সুরা নিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই বিচরণ করে। কেটে যায় কতো বছর, কতো যুগ, তবু পান্থশালায় পথিক আসার বিরাম নেই, সাকীরও লাস্য-মদিরা বিতরণের সমাপ্তি নেই! হয়ত নতুন মুখ, হয়ত বা নতুন পান্থশালাও—কিন্তু লীলাচাপল্য সেই একই।

সেই অঞ্জলি-যতীনবাবু-রাণীদি-সঞ্জয় কাজলদের দল। শুনলাম, সুবালা এসেছে—কিন্তু কেন যেন মনে হল, ওর সামনে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে না। অক্ষয় থাকুক ওর ঘর, ওর নীড়—আমার সঙ্গ ওর মনে ক্ষণিকের জন্যও চাঞ্চল্য জাগাক, এ আমি চাই না।

সরে এলাম, বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কতো লোক জটলা করছে বাইরে, কতো দর্শক ও দর্শিকার দল গুঞ্জন করছে এধারে ওধারে। বিচিত্র, তীব্র আর তীক্ষ্ণ একটা ভেঁপুর শব্দ করতে করতে হুস করে রাজপথ দিয়ে ছুটে গেল একটা হালফ্যাসানের মোটর-গাড়ী। চক্‌চকে সবুজ তার রঙ, ইঞ্জিনের ওপরে নিকেলে তৈরী পাখীর ডানা—গতির দ্যোতক।

—নমস্কার!

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি, পরে একটু চমকে, একটু লজ্জিত ভঙ্গিমাতেই বলে উঠলাম, আমায় বলছেন?

পরিচ্ছন্ন স্যুট-পরা ভদ্রলোকটি বললেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ, আপনিই ত—

—হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু, আপনাকে ত ঠিক—

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, আমার নাম সুশোভন ঘোষ। আমি সুবালার—

ভদ্রলোকও কথাটা শেষ করলেন না, আমিও কোনো কথার সূত্রপাত করতে পারলাম না কয়েকমুহূর্ত।

কী ভাবলেন সুশোভন, কে জানে, উনিও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভিতরে একটা বেল্ বুঝি বেজে উঠল, ভীড় বাড়ল আমাদের আশেপাশে। বললাম, ভিতরে যান, দেখা করে আসুন।

—না। সুশোভন বললেন, আমি দেখা করতে এসেছি আপনারই সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে! কেন?

ম্লান যেন মনে হল ভদ্রলোকের হাসিটুকু, বললেন, দিনকয়েক ধরেই

চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনার ঠিকানা জানতে পারিনি, এখানেও আসেননি। কয়েকটি জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে।

একটু থেমে তারপরে বললাম, বেশ। বলুন।

—এখানে ত হবে না! সুশোভন বললেন, যদি মনে কিছু না করেন, ঐ রেস্তোরাঁতে আসুন না, একটু নিরিবিলিতে কথা হতে পারবে।

—চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে দূরের একটা রেস্তোরাঁতেই গিয়ে বসলাম আমরা একটু নিভৃতি খুঁজে নিয়ে। বললেন, সুবালা বেশী কিছু বলেনি আপনার সম্বন্ধে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কিছু অনুমান করে নিতে পেরেছি।

ভদ্রলোক আমাব হাতদুটো ধবে বললেন, আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না! আমি খুব বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

—বিপদ! বিপদ কিসের?

—সেই কথাটাই আপনাকে বলতে চাই—সুশোভন বললেন, সুবালা আমার স্ত্রী।

হাসিই এসে গেল ঠোঁটের কোণে, বললাম, সে আমরা জানি। আপনার মূল বক্তব্য বলে যান। যত বেশী সোজাসুজি বলতে পারবেন, তত বেশী খুশী হবো আমি।

—সোজাসুজিই আমি বলতে চাই।—সুশোভন বললেন, সুবালার সঙ্গে আপনার আলাপ মাত্র কয়েকদিনের বললেই চলে, কিন্তু আমার সঙ্গে ওর পরিচয় বহুদিনের।

এবারেও একটু হাসলাম, তারপরে বললাম, তা-ও জানি।

বললেন, কিন্তু ও আমাকে ছেড়ে গেছে!

এবার রীতিমতই চমকে উঠলাম, কী বললেন আপনি!

—হ্যাঁ,—সুশোভন মুখ নীচু করলেন—ও আর আমার কাছে থাকে না।

—কেন ?

মুখ তুললেন ভদ্রলোক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বললেন, আপনি কী জানেন না, কেন ?

—না।

তারপরে একটুক্ষণ থেমে—যেন অতিকষ্টে দমন করলেন অন্তরের উচ্ছ্বাস। মুখ নীচু করে, অথচ কণ্ঠে দৃঢ়তা এনেই বললেন, ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া কী আপনার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় ?

আশ্চর্য হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, কী বলছেন আপনি !

বললেন, বড্ড একরোখা মেয়ে। একদিন বলেছিলাম, তোমার ঐ তীব্র জেদই তোমার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আজ দেখছি আমার কথা সত্যিসত্যিই ফলে গেছে !

—কী চায় ও ?

—চিরতরে ঘর ছাড়তে চায়।

বলে উঠলাম, যে মেয়ে ঘরের আস্বাদ কোনোদিন পায়নি, সে যদি পেয়ে থাকে মনের মতো ঘর, তার মায়া কি সে কখনো ত্যাগ করতে পারে ? এ আপনাদের ছ'দিনের মান-অভিমান, এ মেঘ কেটে যাবে। এত চিন্তা করছেন কেন ?

—আমার চিন্তা !—ভদ্রলোক ছ'হাতে নিজের মাথাটা আঁকড়ে ধরলেন, আপনি বোধহয় বুঝবেন না ! ওর এক বান্ধবীর বাড়ীতে রীতিমত ঘর ভাড়া নিয়েছে ইতিমধ্যে। নিয়ে গেছে ওখানে ওর বাক্স-পেঁটরা যা কিছু। সেখানেই থাকবে এবার থেকে।

একটু চুপ করে থেকে তারপরে বললাম, এ-ও ছদিনের। এমনও ত হতে পারে।

—না—না।—সুশোভন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন মনে হল—ওকে চিনি বলেই ভয় পাচ্ছি। ওর যে বান্ধবীর বাড়ীতে ও ঘর নিয়েছে

সে বান্ধবীটির খবরাখবর আমি রেখেছি। আপনাকে বলব কী, ও আব-হাওয়ায় মানুষ বাঁচতে পারে না। ও নিজেকে মেরে ফেলবে বলেই ওখানে গেছে।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপরে বললাম, কিন্তু, এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

—পারেন না কিছু করতে?—সুশোভন তির্যক নেত্রপাত করলেন আমার দিকে, অথচ আপনার জন্যই ত—

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেছি ততক্ষণে,—কী? কী বললেন আপনি?

সুশোভন বললেন, আমার অনুমান, আপনার জন্যই ও আমাকে ছেড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে অর্থহীন তাকিয়ে রইলাম, তারপর বলে উঠলাম, আপনার অনুমান ঠিক কি না তা কাল বলতে পারব আপনাকে। অনুগ্রহ করে কাল একবার এমনসময় আসতে পারবেন কী?

কী ভেবে আর বাক্যব্যয় না করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বললেন, বেশ তাই হবে। কালই আসব।

কিন্তু আর ফিরে তাকালেন না, সোজা হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। আমি রেস্তোরাঁর বিল চুকিয়ে যখন বাইরে এলাম, তখন আর দেখতে পেলাম না তাঁকে। চলমান জনারণ্যের মধ্যে কোথায় মিশে গেছেন, কে জানে।

সেদিন আর আগে-আগেই চলে গেলাম না, বসে রইলাম শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের যবনিকাপাত পর্যন্ত। যতীনবাবুকে সুপুরি-এলাচভর্তি শিশিটা এগিয়ে দিয়ে একসময় কাছে এসে বলে গেল অঞ্জলি, খবর শুনেছেন? মালিকদের ছোটকর্তার চোখ পড়েছে কাজলের ওপর। সে এক কাণ্ড!

আরো কে কে এসে যেন কী-কী সব বলে গেল, কিছু শুনতে পেয়েছিলাম, কিছু পাইনি।

ক্রমে ক্রমে নিভে গেল পাদপ্রদীপ, শূন্য হয়ে গেল নেপথ্য-গৃহ। ওপর থেকে কী একটা গানের কলি গুণগুণ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল সুবালা, হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই বিদ্যুতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে। উঠে এসে ওর কাছে গিয়ে বললাম, চলো আমার সঙ্গে। কথা আছে।

অফিস থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখল প্রণবেশ, দেখল আরও কেউ কেউ। দারোয়ান দেখল আমাদেব চলতি একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে পড়তে। কিন্তু কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করতে পাবিনি সেদিন। সীটেব ওপরে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল সুবালা। সেদিকে একবার তাকিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, চলো, গঙ্গার ধার।

—জী ?

বললাম, স্ট্রাণ্ডরোড ছাড়িয়ে গঙ্গার ধার—ময়দানের পাশে।

আবার একসময় দেখা গেল সেই জাহাজের মাস্তুল ভীড় করে থাকা। কে জানে, এখনো সেই 'সিলভার ওক' জাহাজখানা বন্দরে নোঙর করে আছে কিনা। কিন্তু কোনো কথা নেই সুবালার মুখে, সে তেমনি পড়ে আছে দুটি চোখ বুজে। ড্রাইভার এক সময় বললে, রোকেঙ্গে হিঁয়া ?

—না। চলতেই থাকো।

ডাকলাম, সুবালা ?

—কী ?

—কতোদিন পরে দেখা হল, কিছুই বলছ না যে !

—বলার কিছু নেই।

—কেন ?

—তুমিই ডেকে নিয়ে এসেছ। আমি ত আসিনি নিজে থেকে।

বললাম, তোমার কিছু বলার থাকতে পারে, এটা অনুমান করেই কিছু শুনব বলে তোমাকে ডেকে নিয়ে এসেছি।

—আমার কিছু বলার নেই। সব বলাবলি শেষ হয়ে গেছে আমার।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললাম, যা শেষ হয়ে গেছে বলে তুমি মনে করছ, তা হয়ত সত্যিই শেষ হয়নি, কে বলতে পারে!

বাঁধ-ভাঙা ঝর্ণার মতো হু-হু করা কান্নায় ভেঙে পড়ল এতক্ষণে। বললে, আমার ঘর ভেঙে গেছে গো, আমার ঘর ভেঙে গেছে!

—না। ভাঙেনি।

জলভরা চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে, বললে, কী করে জানলে?

বললাম, সুশোভন এসেছিল আজ আমার কাছে।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল মুখ, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপরে বললে, জানতাম, ও আসবে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, কেমন করে?

বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে, বললে, কেমন করে জানতে পেরেছিলাম, তা'ত বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার মন শুধু বলত, ও তোমাকে একদিন খুঁজে বার করবেই।

—কোনো গল্প কী করেছিলে আমার?

—না।

—কিছুই জানে না?

—না। শুধু সন্দেহ।

—কী?

তেমনি অদ্ভুৎ হাসি ওর মুখে, বললে, ভালবাসা।

টেনে নিলাম ওর হাতখানা হাতের মধ্যে। বললাম, বলেছিলে ঘর তুমি রাখবে। নিজেকে তাই প্রাণপণে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, দরকার নেই অন্তরঙ্গতায়! যদি ঝড় ওঠে?

উত্তর দিলো, তা-ও জানি। নিজেকে কষ্ট দিতে তোমার জুড়ি নেই।

—যে আমাকে একমুহূর্ত না দেখলে থাকতে পারত না, সে জোর করে ফিরিয়ে আছে আমার দিক থেকে মুখ, পাছে দেখা হয়ে যায়!

অল্প একটু হেসে বললাম, কখনো ত বলিনি এমন কথা, কী করে বুঝলে?

ম্লান হাসল সে। বলল, সব কথাই কি মুখে বলতে হয়! আমি বুঝতে পারি না? তোমার চোখই যে সব কিছু বলে দিতো।

—কিন্তু সে কথা যাক্। তুমি ফিরে যাও ঘরে।

তেমনি বাঁকা হাসি ওর মুখে, বললে, কেন?

বললাম, সীমাস্বর্গের তুমি ইন্দ্রানী ছিলে, তোমাকে কখনো যেন কাঙালিনী না দেখি।

ছুটি ক্রন্দসী চোখ আমার দিকে ফেরানো, হাত বাড়িয়ে আমার মাথার চুলে ধীরে ধীরে কর-চালনা করতে করতে অদ্ভুত স্নেহভরা কণ্ঠে বলে উঠল, আমার কথা অতো ভাবে না। আরতিদি কেমন আছে?

—ভালো।

—রুণু ঝুনু?

—ভালো।

—আমার কথা বলে?

—তা বলে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ ঈষৎ চমকে উঠে বসল, বললে, এতরাত্রে ট্যাক্সী করে আমরা কোথায় ঘুরে মরছি? এ যে আবার সেই জাহাজগুলোর পাশে এসে পড়লুম। ছি-ছি, মিটারে কতো কী উঠল কে জানে!

—সে সব তোমাকে দেখতে হবে না। আচ্ছা চলো, তোমার বাড়ীতেই যাই।

একটু হেসে বললে, কোথায়? শোভাবাজারে?

—না। সে ঘর ত ছেড়ে দিয়েছো। যেখানে নতুন গিয়ে উঠেছো, সেখানে!

মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল মুখভঙ্গী। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, না কেন?

—না। আমার বাসায় তোমায় যেতে হবে না।

বললাম, হবে। ওখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব সুশোভনের ঘরে।

ম্লান হেসে বললে, পারবে না।

—কেন পারব না?

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা শক্ত করে চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কান্নাকে রোধ করতে লাগল সুবালা, তারপরে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর বললে, ট্যাক্সী ঘোরাও।

আমার নির্দেশে ঘুরল ট্যাক্সী। কিছুক্ষণ চলবার পর বললে, আমাকে নামিয়ে দাও চৌরঙ্গীতে।

—কেন?

—সব কথা জেনে তোমার দরকার নেই।

বললাম, তোমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সুযোগটুকুও আমাকে দেবে না?

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো, না।

—কিন্তু, কেন?

কী-এক তীব্র অস্থিরতায় ভরে উঠেছে ওর মন, কী-এক দুর্বিসহ চিন্তার বহ্নি যেন জ্বলে পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর ভিতরটা, প্রায় আর্তনাদই করে উঠল বলা যায়,—দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও!

ড্রাইভারটা পর্যন্ত চমকে গেল ওর আর্ত চীৎকারে। থতমত খেয়ে পিছনে তাকাতে গিয়ে ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে ব্রেক্ কষতেও

সময়মত ভুল করে ফেলল সে,—রাস্তার সাদা লাইনটা প্রায় পার হয়ে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে অবশেষে অকস্মাৎ-ই থেমে গেল গাড়ীটা। ও বললে, আমি এখানেই নামব।

—সে কী! অন্ততঃ কিছু দূর গিয়ে—

বাধা দিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, না। আমি এখানেই বাস্ ধরব। দয়া করে ছেড়ে দাও।

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দরজা খুলে তাড়াতাড়ি নেমে গেল গাড়ী থেকে।

আমি সীটের ওপর মাথাটা হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছি, গাড়ীটা কিছুক্ষণ চল্‌বার পরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে পোঁছবা-মাত্রই ড্রাইভার বলে উঠল, আভি কিধর যাইয়েগা বাবুজী?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, শোভাবাজার।

কিন্তু পরমুহূর্তে গাড়ীটা প্রবল গতিবেগ ধারণ করতেই মনে হল, অন্যমনস্কভাবে শোভাবাজার-এরই বা উল্লেখ করতে গেলাম কেন?

সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীটাকে ঘোরাতে বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। মনে হল, হয়েছে ঠিকই। শোভাবাজারেই যাওয়া প্রয়োজন, সেই বাড়ীতে। সুশোভনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে, এবং এই মুহূর্তেই।

সেই প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি কোনক্রমে পার হয়ে ওপরে উঠে কড়া নাড়তেই যে এসে দরজা খুলে দিলো, সে সুশোভন নয়, সুশোভনের বোন,—সুবালার ননদ,—সেই মঞ্জু।

আমাকে দেখে অবাক হবারই কথা। এমনকি আমাকে এতদিন পরে দেখে চিনতে না পারলেও আমি আশ্চর্য হতাম না। কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে উচ্চারণ করল, আপনি?

বললাম, হ্যাঁ। আপনার বৌদি যে এখানে নেই তা' আমি জানি, আমি এসেছি আপনার দাদার সঙ্গে দেখা করতে।

—দাদা? দাদাও ত এখন বাড়ীতে নেই!

—নেই!

—না।

একমুহূর্ত চুপচাপ। ভিতর থেকে মৃদু নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম, সম্ভবতঃ সুশোভনের মা হবেন। অন্য কেউও হতে পারেন, সেই কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই সচকিত হয়ে উঠল মঞ্জু, তাড়াতাড়ি বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল, অনেক কথা আছে।

এবার অবাক হবার পালা আমার। বললাম, আমার সঙ্গে!

ঈষৎ চাপা কণ্ঠে দ্রুত বলে উঠল, হ্যাঁ। আপনি নীচে নেমে গিয়ে একটু দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।

বলেই দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল সে। আমি চিন্তান্বিত ভঙ্গিমায় ধীরে ধীরে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

রাস্তাটা প্রায় নির্জন। একটা ঘেরাটোপ-ল্যাম্পপোস্ট যেন প্রহরীর মতো ঘুম-ঘুম চোখে পথের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। একটা রিক্সা ঠুং-ঠুং করতে করতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নিজেকে মনে হল, কথা-ভুলে-যাওয়া দিশাহারা কোনো অভিনেতার মতো। কী আমার বলার কথা, কী আমার করার কথা,—পাদপ্রদীপের সামনে এসে সব যেন মুহূর্তে ওলোট-পালট হয়ে গেল আমার!

—চলুন!

ঈষৎ চমকে চেয়ে দেখি, মেয়েটি সত্যিই এসেছে নেমে। বললে, কাছেই ছোট্ট একটা পার্ক আছে, ওখানে চলুন।

বলেই চলতে লাগল সে, আর আমি চললাম পিছনে-পিছনে কোনো কথা না বলে।

পার্কটা যথেষ্ট নির্জন—নিরালা। ঘোরালো গেট্‌টা পার হয়ে পাশেই একটা বেঞ্চি খুঁজে নিয়ে বসলাম দুজনে। মঞ্জু বললে, খুবই অবাক হয়েছেন নিশ্চয় ?

বললাম, হ্যাঁ, তা' খানিকটা।

বললে, বাড়ীতে অসুবিধা ছিল সব কথা আপনাকে বলবার। তাই এখানে টেনে আনতে হল।

—বেশ ত !

একটু থেমে তারপরে বললে, কিছু মনে করবেন না, বৌদির কিছু কিছু কথা আমি জানি।

মনে মনে শঙ্কিতই হয়ে উঠলাম, বললাম, কী জানেন ?

মৃদু একটু হেসে বললে, মেয়ে হয়ে মেয়েদের কথা যতটুকু জানতে পারা যায়, সেটুকুই জানি।

আমাকে নীরব লক্ষ্য করে আবার বলতে লাগল মৃদুকণ্ঠে, বৌদিব আমি এতটুকু দোষ দেই না। বৌদির যে মন, যে রুচি,—তাতে আপনার দিকে মন যাওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

মেয়েটির এ'কথায় আশ্চর্য হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলাম, কী বললেন !

মঞ্জু চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ফেরালো। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগল, আমার দাদার না ছিল ধৈর্য, না ছিল কিছু,—ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছিল।

—কেন !

মঞ্জু বলতে লাগল, আশ্চর্য পুরুষের অধিকার-বোধ ! মানুষের মনটা যে বেগবতী স্রোতধারার মতো, এটা বোধহয় তারা মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন করে বুঝতে চায় না !

একটু থেমে তারপরে আবার বলতে লাগল, আমার দাদাকে আমি

শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি,—কিন্তু বৌদিকে ভালবাসি তার থেকেও বেশী। আমি তার জীবনের সব কথা জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই, কিন্তু মনটা জানি।

আবার থেমে গেল মঞ্জু। ধীর, মৃদুকণ্ঠে বললাম, সুবালাকে আপনি যে কতখানি ভালবাসেন, কতো গভীরভাবে যে অনুভব করেছেন তাকে, আমাকে এভাবে নিভৃতে ডেকে এনে এই যে তাব কথা বলছেন, এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তা' বুঝতে পারছি। নইলে আমি কে? নিতান্ত অপরিজ্ঞাত, অপরিচিত একটি লোক।

মঞ্জু আগ্রহের সঙ্গেই শুনল আমার কথা, তারপরে মৃদু একটু হেসে বলতে শুরু করল, অপরিচিত কেন হবেন? শুনতে অভিনব হলেও সত্যিকথা, আপনি বৌদির আপনজন। সেইজন্যই ত আপনাকে সব কথা আমার বলা কর্তব্য।

—বলুন?

কয়েক মুহূর্ত আবার থেমে রইল, বলল, বৌদির সম্পর্কে এত খোলাখুলি আলোচনা করছি বলে আপনি মনে কিছু করবেন না। আমি সম্পর্কে ছোট, কিন্তু নারী ত? নারীজীবনের অনেক কথা থাকতে পারে, যা পুরুষ বুঝতে পারে না, চিরদিনই অব্যক্ত থেকে যায়! আমি মেয়ে বলেই হয়ত বৌদির দুঃখটা অনুভব করবার চেষ্টা করেছি, দাদা পুরুষ বলে যেটা একেবারেই বুঝতে পারল না। আর, বুঝতে পারল না বলেই এই প্রচণ্ড ভুলটা করে বসল দাদা।

—কী ভুল!

একবার আমার মুখের দিকে তাকালো মঞ্জু, তারপরে অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে যেমন বলছিল, তেমনি বলতে লাগল। সেই কথাই ত আপনাকে বলতে চাই। আচ্ছা, বলুন ত? দিশাহারা একটি মেয়ে, অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে,—তাকে যদি হাত ধরে তুলে আনা যায়, তাতে কী পাপ হয়?

—নিশ্চয়ই না।

মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মঞ্জুর, বলল, জানি, আজকের যুগে একথা বলতে আপনার দ্বিধা হবে না। বৌদি এমনি একটি মেয়ে, তাকে নিয়ে এসে দাদা যখন ঘর বাঁধল, ঝড় উঠল চারিদিকে, মা খুসী হলেন না, কিন্তু আমি সেদিন এগিয়ে গিয়ে দাদাকে প্রণাম করেছিলাম। বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে যে নবীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন আমরা দেখেছি, তার একটি রূপ অন্ততঃ তোমার কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল! দাদা হেসে বলেছিল, তুই পার্টির মেয়ে, তুই ত একথা বলবিই!

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, পার্টির মেয়ে! মানে?

মঞ্জু একটু হেসে বলল, কে জানে! দুঃস্থা মেয়েদের সুযোগ-সুবিধা আর অন্নবস্ত্র-সমস্যার দাবী নিয়ে দুটো-একটা মিছিল পরিচালনা করলেই যদি দাদার ভাষায় তথাকথিত 'পার্টির মেয়ে' হয়ে যেতে হয় ত, আমি তা-ই। কিন্তু শুনুন, যা' বলছিলাম। বৌদি সংসারে এসে যেন হাতে স্বর্গ পেলো। অথচ সাজানো গুছানো সংসারই কী সব? দাদার কাছে সে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল, দাদার সেবা, দাদার পরিচর্যা,—তাতেই সে ডুবিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। কিন্তু তার মন? একজনের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়ার বাইরেও যে কিছু থাকতে পারে, দাদা তা বুঝলো না। বৌদি যে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি করতে চাইছে সূক্ষ্ম ও সুন্দর রুচির মধ্য দিয়ে যে আত্মবিকাশ কামনা করছে, দাদা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। জাগল সংঘাত। ছোটখাট নানান্ খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্য দিয়েই 'তা' বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বৌদির তবুও আপোষ করে চলবার চেষ্টার অন্ত নেই। নীড়কে সে এত ভালবাসত! অবশ্য, সব মেয়েই তা ভালবাসে। মনটাকে চুরমার করে গুঁড়িয়ে দিয়েও সে তার ঘর রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে! কিন্তু দাদার সে ধৈর্য ছিল

না, দাদার মনে হল, বৌদির মনে বুঝি তার স্থান নেই। হয়ত তাই। দাদার মনে যা জেগেছিল, হয়ত সেটাই সত্যি। কিন্তু বিরূপ মনকে অবশেষে মানুষ একদিন জয়ও ত করে! দাদার অধিকার-বোধ তখন এত প্রবল যে সে চিন্তাও তার মনে ঠাঁই পায়নি। ফলে,—অশান্তি, অস্থিরতা, দুঃখ আর সংঘাত!

বললাম, তাই বুঝি সুবালা ছেড়ে চলে গেল আপনাদের সংসার?

ম্লান-একটু হাসল মঞ্জু, বলল, তাকে যে যেতেই হবে। অন্যজন যখন আসে, একজনকে তখন তার স্থান করে দিতেই হয়!

আশ্চর্য হয়ে বললাম, কী বলছেন আপনি?

মঞ্জু বললে, দাদা আবার বিয়ে করেছে।

নিদারুণ চমকে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, বিয়ে করেছেন আপনার দাদা?

—হ্যাঁ, কাল।

চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। মঞ্জু বললে, বৌদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বিয়ে দিয়েছে। রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়েছে ওদের নিয়ে নিজে উদ্যোগ করে। নিজেই ছিল প্রধান সাক্ষী।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু, বললে, এর পরও কী বলতে হবে, বৌদি নীচ, স্বার্থপর?

নির্বাক, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, মঞ্জু আবার বললে, আপনাকে কিন্তু সবই শুনতে হবে। চাপা মেয়ে, নিজের মনের কথা কাউকে কিছু কোনদিনই বলে না, শুধু একদিন আমাকে হঠাৎ বলে ফেলেছিল, মঞ্জু, ওঁকে দেখেছ? বললাম, কাকে? বললে, ঐ যে বাড়ীতে সেদিন এসেছিল, নাটক-লিখিয়ে? তারপরেই একটু থেমে বলে উঠেছিল, মঞ্জু, বড়ো হৃদয়বান লোকটি, এত বড়ো মন, এত স্নেহ-[illegible]—! কথাটা শেষ করতে পারেনি, চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কিন্তু আমিও ত মেয়ে, আমার কী বুঝতে বাকী ছিল সেদিন কিছু? তাই বলছিলাম,—

মঞ্জু থেমে যেতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, সব আমাকে বলুন আপনি!

মঞ্জু বললে, ছুদিন বৌদি থিয়েটারে কামাই করেছিল, না?

—হ্যাঁ, তা' করেছিল।

বললে, এইজন্যই। কৃষ্ণনগরে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ একা।

—কেন!

বললে, মেয়েটিকে আনতে। এনে নিজের সাজানো সংসারে ওকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজেই সরে গেল দূরে।

—কিন্তু মেয়েটির সন্ধান পেলো কী করে ও?

—দাদার কাছ থেকেই বোধহয়।

একটু উত্তেজনাই সম্ভবতঃ জাগল আমার কণ্ঠস্বরে, বললাম, আপনি সুবালার ঠিকানা জানেন?

—না। আপনি জানেন না?

—না।

মঞ্জু বললে, আশ্চর্য ত!

—আশ্চর্য নয়, ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওর কথাই ত ওর জীবন-সম্বন্ধে শেষ কথা নয়! আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি এভাবে আমাকে সব কথা না জানালে আমার পক্ষে তা জানতে পারা কঠিন হত।

মঞ্জু বললে, সত্যিই কঠিন হত! বৌদি যে চাপা মেয়ে! মুখ-বুজে সব-কিছু সহ্য করতে ওর জুড়ী নেই!

বললাম, আচ্ছা, দেখুন, আপনার দাদা হয়ত এতক্ষণে বাড়ী এসেছেন।

—হ্যাঁ, তা' হয়ত এসেছে।

বললাম, দেখা করে ওর ঠিকানাটা জেনে নেই। আপনার দাদা নিশ্চয়ই জানেন, কী বলেন ?

—তা' জানতে পারেন।

হু'তিন পা এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম, বললাম, না থাক্, সুবালার সঙ্গে আমার ত কাল দেখাই হবে থিয়েটারে, তখনই সব আমি জেনে নেবো। আপনার দাদাব সঙ্গে এখন দেখা করতে যেন মন আমাব কিছুতেই চাইছে না।

আমার পাশাপাশি হাঁটছিল মঞ্জু, বললে, সেই ভালো।

চলতে চলতে বললাম, একটা প্রশ্ন মনে বারবারই জাগছে মঞ্জুদেবী, সুবালা ঐ মেয়েটির কথা যদিই বা জানতে পারল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিল কেমন করে ? কোন্ শক্তিতে ?

বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল মঞ্জুর মুখে, বললে, কে জানে! হয়ত আপনিই ওব সেই শক্তি !

দাঁড়িয়ে পড়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম অবাক হয়ে। অল্প একটু হেসে আবার চলতে শুরু করল মঞ্জু, গেটটা পার হয়ে গলিপথে এসে বাড়ী পর্যন্ত নীববই ছিল সে! দরজা দিয়ে ভিতরে যেতে যেতে শুধু একবার ফিরে তাকালো আমার দিকে, হুটি হাত জোড় করে জানালো, নমস্কার !

প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। মনে হল, মঞ্জুর নিজেরই কোনো অব্যক্ত বেদনার তারে রীণ্ রীণ্ করে বুঝি বেজে উঠেছিল সুবালার মনের হাহাকারের রেশ,—নইলে নারী হয়ে নারীর ব্যথাই বা এম্নি করে বোঝবার মতো নারী এ সংসারে আছে কয়জন ?

মঞ্চের ঠিক পিছন দিকে সিঁড়ির কাছে যে প্রায়ান্ধকার স্থানটুকুতে প্রায়ই দেখতাম রাণীর সঙ্গে একান্তে কথা বলছে সঞ্জয়, পরদিন ঠিক

সেইখানে একসময়ে ডেকে নিয়ে এলাম সুবালাকে, বললাম, আমাকে কেন বলোনি সবটুকু ?

—কী ?

—সুশোভন বিয়ে করেছে, এসংবাদটা শুনতে হল অন্যের কাছ থেকে ?

চট্ করে মুখটা ফেরালো অন্যদিকে, কয়েকমুহূর্ত বলতেই পারল না কোনো কথা। তারপরে বললে, কার কাছে শুনলে ?

—নাই বা শুনলে সেটা ? নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলে কোন মনের জোরে ?

দুটি বিহ্বল চোখের দৃষ্টি মেলে ধরল আমার চোখের দিকে, একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে, এ'মনের জোর কে দিয়েছে না-ই বা শুনলে সেটা ?

—হার মানলাম। কিন্তু জানলে কেমন করে মেয়েটির কথা ?

মুখ নীচু করল, তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললে, মেয়েটির কোলে একটি শিশু আসতেই সব জানা হয়ে গেল !

—সেকী !

বললে, সেরাত্রে কেমন যেন অস্থিরতা দেখলাম। সন্দেহও হল। বললাম, কী হয়েছে সত্যি করে বলোত ?

—বললে মেয়েটির কথা। দুঃস্থা এক মায়ের মেয়ে। তাকে বিয়ে করবে এই আশা দিয়ে মিশত।

—কৃষ্ণনগরে ?

—হ্যাঁ। টুরে প্রায়ই যেতো সেখানে। হয়ত আমার ওপর অভিমান করেই—

—তারপর ?

—তারপর ?—সুবালা একটু থেমে, ম্লান একটু হেসে বললে, রাগ হল না, দুঃখ হল না, ভাবলাম, সত্যিই ত, ওর দোষ কী ?

আশ্চর্য হয়ে বললাম, দোষ কী !

বললে, না, সত্যিই ওকে দোষ দেওয়া যায় না। কী দিতে পেরেছি ওকে ? এই যে গৃহবধূর সম্মান আমাকেও দিয়েছিল, তার প্রতিদানে ওকে আমি সন্তান দিতে পারিনি। এমন কি, আজ আবার বাইরে এসে পথে নেমে বুঝতে পারছি, ভালবাসাও দিতে পারিনি ওকে !

বললাম, কাকে বলে ভালবাসা ?

—নিশ্চয়ই নিছক দেহবিলাসকে নয়।

বললাম, মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, তোমার দুটি হৃদ্‌পিণ্ড। তার একটি হচ্ছে সুশোভন।

কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল সুবালার, বলল, আমার হৃদ্‌পিণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে !

রুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠ, কিছুক্ষণ বলতে পারল না কথা।

বললাম, সুশোভন এখন কী বলতে চায় ?

—বলতে চায়, ও-ও থাকুক, তুমিও থাকো।

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, না। কখনই তা' হতে পারে না !

অল্প একটু হেসে বলল, পারে না ত ?

—না।

বাঁকা হেসে বললে, এই উত্তরই দিও সুশোভনকে। আবার যদি সে আসে।

—হ্যাঁ, দেবো। আর, তোমার ব্যাপারে আমার অধিকারের সীমারেখা করবও বিস্তৃত।

অদ্ভুৎ এক হাসিতে উদ্ভাসিত দেখাল ওর মুখ, বললে, করবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

কিন্তু এক-এ আর এক-এ যে দুই হয়, এটা জানা থাকলেও অনেকে

যোগফল আমার জীবনে মেলেনি। অবধারিত অঙ্কপাতেও বুঝি এমনি করেই ভুল হয়ে যায়! হিসাব মেলাতে মন রাজী না হলেও জীবনের হিসাব নিয়ে এক একসময় বসতে হয়, কিন্তু কোথায় যে ভুল, তা ধরতে না পেরে মূঢ়ের মতো আমরা বসে থাকি! মনে হয়, জানতে গিয়েও জানা হয়নি। বিশ্ব-রহস্যের উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখি, সেই শিশুকালে অগণিত নক্ষত্রের দীপ-জ্বালা রাত্রে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত যে নীহারিকা-মণ্ডলের দিকে দুর্দমনীয় কৌতূহল নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, আজও, এই পরিণত বয়সেও, সেই দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়ে আছি শিশুর মতো। আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে, বলে শুধু, বুঝিয়ে দে—বুঝিয়ে দে—বুঝিয়ে দে!

সুশোভন সেদিন এসেছিল যথারীতি। বললাম, আপনার অনুমান ঠিকই হয়েছে বন্ধু, আমার জন্যই ও আপনাকে ছেড়ে গেছে!

মুহূর্তে যেন পাংশু হয়ে গেল মুখখানা, শুধু বললে,—ও!

বললাম, এবার থেকে আমার কাছেই ও থাকবে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, তা থাকুক। কিন্তু যে বাড়ীতে গেছে সেখানে যেন ওকে রাখবেন না।

—কেন!

—বাড়ীটা ভালো নয়।

তারপরেই আমার হাত দুটো ধরে বলে উঠলেন সুশোভন, কিছু মনে করবেন না, যদি কোনদিন কিছু দরকার হয় ত—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, না কোনো দরকার হবে না। আপনার নতুন সংসার নিয়ে আপনি সুখে থাকুন, এই প্রার্থনা।

—ও! সবই শুনেছেন?

—শুনেছি।

কিন্তু আর কোনো কথা বললেন না সুশোভন, তাকালেনও না আমার দিকে, ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে মিশে গেলেন প্রবহমান জনস্রোতে।

ইতিমধ্যে, আবার ঢেউ জেগেছে নিস্তরঙ্গ সরোবরে। আবার সেই কলরব। আবার সেই 'ছি-ছি' কার চারিদিকে। কিন্তু ওদের ত বলতে পারি না, কী হয়েছে সুবালার? ওদের ত এখন বলা নিরর্থক সেই দু'হাজার বছর আগেকার কথা।

হাতিপোলের সেই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মটি থেকে রাত্রির ঘনান্ধকার তখনো যায়নি মিলিয়ে। শুকতারাটি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আকাশে। পূর্ব দিবসের শপথকে স্মরণ করে অভিসারিকার মতো কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন টেনে দেবদত্তর কাছে এসে বক্ষলগ্না হয়েছে সুতনুকা, বলছে, ঐ ভোরের শুকতারাকে সাক্ষী করে আমরা আবদ্ধ হলাম মৈত্রীবন্ধনে।

—মাত্র মৈত্রী!

মুগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি দেবদত্তের চোখের ওপর নিবন্ধ করে বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠে সুতনুকা, তারামৈত্রী। দেহ সম্পর্কের ক্লেদের মধ্যে অবতরণ করে আমাদের প্রেমকে কি পুরাতন করতে চাও তুমি?

আশ্চর্য হয়ে দেবদত্ত বলে ওঠে, আজ এ-কথা কেন?

কী-এক অজানিত, অসম্ভাবিত পরিণতির আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে সুতনুকার কণ্ঠস্বর, আমি সংসারের এমন বহু দিক দেখেছি রূপদক্ষ, যা তোমার চোখে পড়েনি। তোমাকে কাছে টানলেই, ভয় হয় বুঝি হারাবো।

—আর এ কথা কেন!

দুটি মৃণালভুজ লতিকার মতো ওর কণ্ঠদেশে জড়িয়ে দেয় সুতনুকা, বলে, নারী হলে বুঝতে এ কথা কেন বলেছি!

প্রমত্তের মতো আপন আলিঙ্গনে দেবদত্ত টেনে নেয় ওকে, বলে ওঠে, কিন্তু আমি যে তোমার সব চাই সুতনু, তোমার দেহ, মন, প্রাণ, সব।

বিচিত্র হাসি হেসে দু' হাতে ওর আলিঙ্গন শিথিল করে দিতে দিতে বলে, তার থেকেও ত বড়ো-কিছু তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম রূপদক্ষ।

দেহের তৃষ্ণাও একদিন মেটে, মেটে মনের তৃষ্ণাও, এমন কি এক প্রাণও হাঁপিয়ে ওঠে এক-এক সময় আরেক প্রাণের টানে। কিন্তু আত্মার তৃষ্ণা থাকে অনন্তকাল। সেই আত্মাকে চেয়েছিলাম তোমার কাছে উৎসর্গ করে দিতে! বড়ো কঠিন সে সাধনা! কাছে থেকেও কাছে না-থাকার তপস্যা।

ছ'হাজার বছর পরে সুবালার মধ্যেও জেগে ওঠে সেই একই চিন্তা-স্রোতের উদ্বেলতা। কপালে, গালে, মুখে, হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, না গো, কাছে টানতে আর চেয়ো না।

আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, কেন ?

বিচিত্র হাসিতে ভরে গিয়েছিল সুবালার মুখ, বলে উঠেছিল, কাকে কাছে টানবে ? মরা মানুষকে ?

—মরে গেছ তুমি !

ম্লান দেখালো যেন ওর অধরের হাসি, বললে, মৃত্যু আর কাকে বলে ?

ছ'হাতের কঠোর বন্ধনীর মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে বলেছিলাম, মরতে দেবো না তোমাকে আমি ! আর তাছাড়া এ আমার কর্তব্য ! আমার কর্তব্য তোমাকে আমার কাছে রাখা।

ছটি চোখ বুজে ফেলল, আমার বুকে মাথা রাখল অনেকক্ষণ, তারপরে মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। অবশেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ-ই এক সময় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল সুবালা, মাথাটা হেলিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায় বলে উঠল, মন্দ বলোনি। ছজনে নীড় বাঁধলে মন্দ হয় না !

বললাম, তবে এসো।

তেমনি মিটিমিটি হাসতে হাসতেই বললে, পারবে থাকতে ?

—পারব না কেন ?

তখনো কৌতুকে কাঁপছে ওর ছটি চোখের তারা, বললে, তোমার ঘর-সংসার ?

—তা-ও থাকবে।

তীব্র জ্বালাধরা কণ্ঠে বলে উঠল, না, তা' থাকবে না। তুমি আমাকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠবে, তাদের ভুলে যাবে।

একটু আশ্চর্য হয়েই বললাম, এ' তুমি কী বলছ!

কেমন-যেন কান্নাভরা দীর্ণ শোনালো ওর কণ্ঠস্বর, বললে, এমনিই যে হয়!

বলতে বলতে হাতের মধ্যে টেনে নিলো আমার হাত দুটো, বললে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা আছে। আর যাদেরই হোক, .অন্ততঃ তাদের সুখশান্তি আমি ছিনিয়ে নেবো, এমন রাক্ষুসী আমি নই গো, এমন রাক্ষুসী আমি নই!

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরেই বলে উঠলাম, কিন্তু তোমার কী হবে? তুমি থাকবে কোথায়?

অদ্ভুত ওর মুখের সেই হাসি, বললে, আমার কথা আমাকেই ভাবতে হবে।

—কিন্তু, কেন?

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তে সরে গেল দূরে, বললে, এ কেন-র উত্তর কী করে দেই তোমাকে, কী করে দেই!

বলতে বাধা নেই, এর পরের কয়েকটা দিন নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই পার হল আমার মন। অঞ্জলি একদিন বললে, আয়নায় মুখ দেখেন? কী হয়ে যাচ্ছে আপনার চেহারা দিন-দিন?

—খুব লেখাপড়ায় ব্যস্ত কিনা, তাই হয়ত—

—না।—অঞ্জলি কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরল—আমি জানি কী আপনার হয়েছে।

—কী!

বললে, কেন ছুটছেন ঐ মায়ামৃগের পিছনে ?

—মায়ামৃগ !

—হ্যাঁ—বলতে বলতে ছলছল করে এলো অঞ্জলির চোখ—বয়সে হয়ত আপনার কিছু ছোটো, কিন্তু, আপনাকে দেখি আমি শিশুর মতো। ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনিকে ভোলাতে রাজা পাঠিয়েছিলেন কয়েকজন রূপসীকে, সে বৃত্তান্ত জানেন ত ?

বললাম, জানি। 'কোন দেব তুমি আনিলে দিবা, তোমার পরশ অমৃত-সরস, নয়নে তোমার দিব্য বিভা !'

অঞ্জলি বলে উঠল, যার বিভা দেখেছিলেন মুনি, সে কিন্তু বদলে গেল একেবারে ! কিন্তু এ কী হচ্ছে এখানে ?

—কী হচ্ছে ?

বলল, আপনার তপোভঙ্গ হল, কিন্তু আপনার প্রেমে ত তার অন্তর টললো না, সে যে আরও ভাসতে লাগল !

—কে ! সুবালা ?

—হ্যাঁ। শুধু নিশীথ নয়, প্রবীর বলে যে নতুন ছেলেটি এসেছে, যেমন চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য, তার দিকেও চোখ ফেলেছে !

বললাম, জানি।

—কী করে জানলেন !

—প্রণবেশ আমাকে বলেছে।

অঞ্জলির কণ্ঠে একটা উল্লাস লক্ষ্য করলাম। প্রণবেশদা তবে জানেন ? তা'হলে ভালই হয়েছে।

কিন্তু আমি জানি, প্রণবেশের পক্ষে ভাল-মন্দর আর কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাকে আর তিরস্কার কর না কেন, প্রণবেশ ?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিল, কিছুই করার নেই। বিষবৃক্ষোহপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ংছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্। যে বৃক্ষ তুমি রোপণ

করেছো, তা বিষবৃক্ষ হলেও তাকে নিজের হাতে উপড়ে ফেলা ঠিক নয়।' ও যা হবার তা এমনিই হবে। দেহের লীলায় সুখ নেই ভাই, দুঃখই বেশী। স্বপ্ন-বাসবদত্তা থেকে মৃচ্ছকটিক, সবই আমার কথার সাক্ষ্য দেবে।

একটু হেসে বলেছিলাম, আমি কী দেহের লীলায়—

—না।—প্রণবেশ আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বললে, লক্ষ্য করেছি, তোমার দিকে চোখ নেই ওর, ও এখন অন্য অনেককে নিয়ে মত্ত। শুনতে চাও? তবে শোনো।

শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল, যেন অন্য কোন এক দুশ্চারিনীর কাহিনী শুনছি। অসহিষ্ণু কণ্ঠে শেষ পর্যন্ত বলে উঠলাম, না-না থাক, আর বলো না।

হেসে উঠে একটা সিগারেট ধরালো প্রণবেশ। তার এই সহজ ভঙ্গিমা দেখে বলে উঠলাম, কিন্তু নিশীথদের এইসব ব্যাপার নিয়ে তোমার শাসন উদ্যত হয়ে উঠছে না কেন, প্রণবেশ?

ধূমোদ্‌গীরণ করে প্রণবেশ বললে, শুনবে? তোমারই জন্য।

—আমার জন্য! কেন?

ঠিক সুবালারই মতো তারই কথার প্রতিধ্বনি করে প্রণবেশ বলে উঠল, এ কেন-র উত্তর তোমাকে আমি কেমন করে দেই!

ও যখন একটা সংলাপ বলে হাসির লহর তুলে পাদপ্রদীপের ঔজ্জ্বল্য থেকে নেপথ্যলোকের স্বল্পালোকে চলে এলো, ওর ঠিক সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, সুবালা?

মুখ তুলে আমাকে দেখে একটু যেন আশ্চর্য হল, বলল, কী?

নিম্নকণ্ঠে বলে উঠলাম, কথা আছে।

—কী কথা?

বললাম, আজ সন্ধ্যাবেলা যাবে, কোথাও বসে—

—বেশ।

আমি একটা পার্কের নাম করলাম, বললাম, গেটের কাছে থাকব।

—থেকো।

কিন্তু প্রায় দু' ঘণ্টা পায়চারী করলাম বৃথাই, ও এলো না।

পরদিন দেখা হতে বললে, ভীষণ শরীর খারাপ করেছিল কাল, জানো?

একটুক্ষণ থমকে থেমে থেকে তারপরে বললাম, ঠিকানা দাও। আজ তোমার বাড়ী যাব।

প্রায় ধমকের সুরেই বলে উঠল, না। আমি একা সম্মান নিয়ে সেখানে থাকি। কে তুমি যে সেখানে যাবে? কী পরিচয় আমি দেবো তোমার সেখানে?

—পরিচয়! বলবে যে আমি তোমার—

—থাক!—দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল সুবালা, ওসব মিথ্যা কথা আমি বলতে পারব না।

আরেকদিন বললাম, আজ চলো না কোনো পার্কে—

—না।

—না কেন?

—আমার কাজ-কর্ম আছে না!

ধীরে ধীরে বুঝতে সুরু করলাম। এ নাটকের যবনিকাপাত করে অন্য কোথাও অন্য কোনো নাটকের যবনিকা উদ্ঘাটিত করতে চায়, এর মধ্যে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কেন এ বিড়ম্বনা? এ কেন-র উত্তর আমিই বা কী করে নিজেকে দেই!

একটা দুর্জয় অভিমান এসে আমাকেও আচ্ছন্ন করল অবশেষে। বুঝলাম, সময় হয়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। অস্বাভাবিক

কাজের ভীড়ে ডুবিয়ে দিলাম নিজেকে। যেটুকু অবকাশ, সেটুকুও কাটে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পড়াশোনা নিয়ে। 'পাদপ্রদীপ'-এ কথা বলি না সুবালার সঙ্গে, ও-ও যে উৎসুক হয়ে ছুটে আসে, তাও নয়। অঞ্জলি একদিন বললে, আজকাল ভালো লাগে আপনাকে দেখলে।

প্রণবেশ বলে, বন্ধু, আছো ত ভালো ?

কাজল এসে বলল, জানেন একটা কথা ? রাণী চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে।

—কে ! আমাদের রাণীদিদি ?

—হ্যাঁ। সঞ্জয়ের সেইজন্য মন খারাপ।

—সেটা ত স্বাভাবিকই।

—না তার জন্য নয়—কাজল ঠোঁটের কোণে একটু হেসে বললে, অন্য কারণে। আপনি শোনেননি ? ওরা যে বিয়ে করছে !

—কারা ! সঞ্জয় আর রাণী

—হ্যাঁ।

শোনামাত্র অদ্ভুত, অভাবিত এক উল্লাসে ভরে উঠল সারা মন ! বললাম, কই রে, রাণী কোথায় ? সিনে ?

—না। তেতলার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। যান না ?

তাড়াতাড়ি প্রায় ছুটেই গেলাম ওর কাছে। ঘোর লাল রঙের একটা শাড়ী পরে, মাথায় ঘোমটা টেনে এক নবীনা পল্লীবধুর রূপসজ্জা নিয়ে ও বসে ছিল। ডাকলাম, বহুদিন পরেই ডাকলাম, রাণীদি ! কোনো উত্তর এলো না, একটু সন্দেহ হতেই ভালো করে তাকিয়ে দেখি, —মুখখানি প্রাণপণে নত করা, কিন্তু দুটি চোখ ছাপিয়ে ধারা নামছে।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে কাঁধের ওপর হাতখানা রাখলাম, বললাম, বিয়ে করছিস, এ খবরটা বুঝি নিজের মুখে জানাতে পারলি না ? এতো অভিমান !

বললে, আমি ছোটবোন, না হয় ভুল করেছি, কিন্তু তুমিও ত ডেকে একটা কথা বলোনি ?

বললাম, কী ভুল করেছিস রে ?

বললে, ঐ সুবালাটাকে আমি দুচোখে দেখতে পারতাম না, বড়ো কু-চরিত্তিরের মেয়ে। আমি যাকে দাদা বলেছি, শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি, সে কেন ঝুঁকবে ঐ মেয়েটার দিকে ? তাই রাগ হয়েছিল তোমার ওপর। আমি কেন, ও-ও কথা বলত না তোমার সঙ্গে। নইলে ভিতরে ভিতরে ও-ও তোমাকে—

—কে, সঞ্জয় ? জানি। কিন্তু বোন, এখন আর রাগ নেই বুঝি ?

নির্মল হাস্যে ভরে গেল ওর মুখ, বললে—না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললাম, চাকরী ছাড়ছিস কেন ?

—ইচ্ছে।

—ইচ্ছে কেন ? সঞ্জয় চায় না বুঝি তুই চাকরী করিস ?

—না দাদা। ও চায় আমি চাকরী করি, আমি আরও বড়ো শিল্পী হয়ে উঠি।

—সেই ত ভালো।

—না।—দৃঢ়, দীপ্ত কণ্ঠে রাণী বললে, হয় ঘরের বউ হব, নয় অভিনেত্রী হব—একসঙ্গে দুটো হওয়া যায় না। হতে গেলে জ্বলে পুড়ে মরতে হয়, মনের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

দ্রুত পায়ে সরে এলাম ওর কাছ থেকে। এইটুকু বয়সে কী নিদারুণ সত্য কথাটাই না উপলব্ধি করতে পেরেছে রাণী! কিন্তু, আরেকজন ?

কোথায় সে ? অন্ধকার একটা কোণ বেছে নিয়ে নিশীথের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কথায় মগ্ন। অঞ্জলি মুখ টিপে হেসে সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে যতীনবাবুকে। যতীনবাবু 'ম্যাক্রোপোলো'য় সজোরে টান দিয়ে সৃষ্টি করছেন আরও ধোঁয়ার। অঞ্জলি মুখ না সরিয়ে নিয়ে

নাসিকা কুঞ্চিত করে চাপাস্বরে বলছে, আঃ! হচ্ছে কী এসব! দিনদিন ছেলেমী বাড়ছে যেন!

'পাদপ্রদীপ'-এর আলো তখনো আমাকে টেনে রেখেছে। আমার বইয়ের ক্রমশই বাড়ছে জনপ্রিয়তা। একশো থেকে দুশো, দুশো থেকে তিনশোয় এসে দাঁড়ালো অভিনয়-রজনী। কাজল একদিন একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, দাদা, শোনো?

—কী?

—কিছু না, তোমাব সঙ্গে একটু কথা বলব বলে তোমাকে টেনে আনলুম। বোসো এই চেয়ারটায়। নিরিবিলি আছে।

বসলাম। বললাম, কী ব্যাপার?

আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, বললে, ভালবাসা কী মবে যায় কখনো?

—ছেড়ে দে ওসব কথা! শুনে শুনে পচে গেছে!

ছলছল করে এলো অমনি দুটি চোখ, বললে, না। মানুষেব বোধ-হয় এই-ই সব। শুধু মানুষ কেন, বিশ্বজগতেব সর্বত্রই। শেলীব সেই কথা—

—থাক রে। আব ভালো লাগছে না এ আলোচনা।

বললে, কথাটা চাপা দিও না দাদা! তুমি যে এই এতদিন মুখ ফিরিয়ে আছো, ভুলতে কী পেরেছ সুবালাকে?

একটু হেসে বললাম, তাতে কারই বা কী আসে যায় বল?

বললে, ও কী করছে জানো? হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাচ্ছে না।

—কী?

—ঘর।

মনে মনে চমকে উঠলাম, বললাম, কী করে জানলি তুই?

—জানি। নিজের মন দিয়েই জানি। নিশীথ যে ওকে নিয়ে

ঘর বাঁধবে না তা ও জানে! প্রবীর যে ওকে ঘর-সংসার দেবে না, তা-ও ও জানে। তাই—

—তাই, কী?

একটু দম নিয়ে কাজল বলল, এত ঝড়ঝাপটা খেয়েও মানুষ যে সেই একই ভুল করতে পারে, তার প্রমাণ ঐ মেয়েটি।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, মানে?

—সেই কথাই ত তোমাকে বলতে চাই দাদা। আমাদের পাড়ার একটি ছেলে, ছোটখাটো ব্যবসা আছে ক্যানিং স্ট্রীটে, বেণু মুখার্জী বলে একডাকে তাকে পাড়ায় চেনে। তার সঙ্গে ওর ভাব হয়েছে সম্প্রতি।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। দেখতে অবশ্য সুপুরুষ ঐ বেণু মুখার্জী। বিয়ে-থা করেনি। বয়সে ওর সমান, কি বছর খানেকের ছোটও হতে পারে। ওকে আমাদের পাড়ায় ডনজুয়ান বলে সবাই ডাকে।

—তুই চিনিস বুঝি?

—হ্যাঁ, দাদা। মুখে ম্যাক্স-ফ্যাক্টর যেদিন থেকে উঠেছে, সেদিন থেকে ও আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু লোক ভালো নয়, বিশ্বাস করি কী করে?

বললাম, কিন্তু, তুই কী বলতে চাস, সুবালা ওকে বিশ্বাস করেছে?

—সম্পূর্ণ। মরেছে মেয়েটা।

নিরর্থক বুকের ভিতরটা একবার কেঁপে উঠল আমার, বললাম, একথা তুই ভাবলি কী করে?

বললে, ঘরের নেশা যে কী জিনিষ, তা আমরা বুঝি! কিন্তু আমি জানি, দারুণ আঘাত পাবে সুবালা, ঘর ও পাবে না।

বললাম, পেতেও ত পারে।

—না। আর, একথা আমার থেকেও বেশী কেউ জানে না।

একটু আশ্চর্য বোধ করলাম ওর এ কথায়, বললাম,—কেন ?

—সুবালাকে বিয়ে করবে এই আশ্বাস দিয়েও পরশু আমাকে ফোন করেছিল ডন জুয়ান।

—কেন ?

ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসির রেখা ফুটিয়ে কাজল বললে, এনগেজমেণ্ট।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললাম, তুই কি বললি ?

বললাম, লজ্জা করে না ? সুবালার সঙ্গে এত মিশছেন, আবার—! তা ফোনেই বললে, পৈতে ছুঁয়ে বলছি, সুবালার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

বলে উঠলাম, একথা ত বোন তুই বলতে পারিস সুবালাকে।

—বলেছিলাম কাল। আজ শুনলাম, সুবালার কাছেও পৈতে ছুঁয়ে বলেছে, কাজল বলে কোনো মেয়েকে সে চেনেই না !

—সুবালা কি বললে তোকে ?

—বলবে আবার কী ? সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে মুখার্জীর কথায়।

চুপ করে রইলাম। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে ও-ই ডেকে উঠল, —দাদা ?

—কী ?

—কেন তোমাকে বললাম সব কথা ?

—তুই-ই জানিস !

বলল, পারো না ? পারো না তুমি ওকে ফেরাতে ?

দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম, আমি হেরে গেছি বোন। আমার সঙ্গ দিয়ে আমি মানুষকে বিপথ থেকে স্ব-পথে টেনে আনতে পারি, এই ছিল অহঙ্কার। যিনি এই বিশ্বের নিয়ামক, তিনি আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বোন, এবার তোকে একটা কথা বলি ?

—কী ?

একটু থেমে তারপর বললাম, দেখ, তোর মুখে আজকাল অদ্ভুত একটা তৃপ্তির আভাস লক্ষ্য করছি। এযাবৎ দেখতাম, কী একটা জ্বালা, কী এক অস্থিরতা যেন ভেসে ভেসে বেড়াতো তোর চোখে মুখে। আজ-কাল দেখি কোথায় সরে গেছে সেই অস্থিরতা ! সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে পরম এক প্রসন্নতা ! যেন খুঁজতে খুঁজতে, যা পাবার তা তুই পেয়ে গেছিস।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাজলের মুখ, তাড়াতাড়ি উঠে গলায় আঁচল দিয়ে হঠাৎ-ই নীচু হয়ে প্রণাম করে বসল আমাকে, কিছু বলল না।

আশীর্বাদ জানিয়ে বললাম, কে রে সে ?

সমস্ত মুখখানা হয়ে উঠল আরক্ত, বললে, বলতে পারব না তার নাম।

—জানি।

—কী জানো ?

—সুশীলবাবু। আমাদের 'পাদপ্রদীপ'-এর—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলাম।

অতর্কিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বললাম, আশীর্বাদ করি, ঘর যেন তুই পাস।

এবার অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, পাবো দাদা। তাঁকে আমার স-ব কথা বলেছি। তিনি কিন্তু মুখ ফেরাননি।

—লোকটি মহৎ।

কাজল গাঢ় কণ্ঠে বললে, মহতের মহত্বও বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া চাই। সুবালার কথা ত শুনেছি, সুশোভনবাবুর ঘর ও রাখতে পারল না। ভেবে দেখো, দোষ সুশোভনবাবুর নয়, দোষ সুবালার। ওর রক্তে নেই একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠতার প্রদীপশিখা না

জ্বললে অপরের প্রাণেও আগুনের পরশমণি ছোঁয়ানো যায় না ! তাই, একদিন জাগে সংশয়, ওঠে ঝড়, সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায় !

চমকে গেলাম কাজলের এই জীবনোপলব্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করে। বললাম, সুশোভনকে নিয়ে ও-ত একনিষ্ঠ হবার চেষ্টা কবেছিল !

—না। একনিষ্ঠতা কাকে বলে, সে ধারণা ওর নিজেরই নেই। ও ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মেছে, কিন্তু সেই মাটির বস ও নিতে চেষ্টা করেনি। নইলে রক্তের আহ্বানকে ও জয় কবতে পাবতো। তোমার চোখ এড়াতে কেউ পারে না। অঞ্জলিদিকে নিশ্চয় দেখেছ ? পাদপ্রদীপেব আলোয় দাঁড়িয়েও একনিষ্ঠ যে কতদূব হওয়া যায়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ সে।

বলে উঠলাম, যতীনবাবু, না !

—হ্যাঁ।

আবার একটু দম নিয়ে বলে উঠল, আজ সবাই সুবালাকে যে কতো ঘৃণার চোখে দেখে, তা বোঝবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত ওর নেই।

ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম, এটাই আমাকে ভয়ানক ব্যথা দেয়, দিদি। তবে শোন। এব মধ্যে একদিন এসব কথা লিখেই একটা চিঠি ওর হাতে দিতে গিয়েছিলাম, ও সেটা হাতে নিয়ে একবর্ণও না পড়ে আমার সামনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

—আশ্চর্য নয়,—কাজল বলল, ওর ফিলসফি কী জানো ? ওর ধারণা, দেহদান আমি কবতে পারি অন্য কাউকে, কিন্তু তোমাকে দিয়েছি মন,—অতএব, একনিষ্ঠতায় আমি কম কিসে ? কিন্তু হতভাগী জানে না,—দেহ ও মন ঐ একজনকেই দিতে হয়, নইলে কিছুই মেলে না। তাই বলছিলাম, ও মরবে। দিন দিন অধঃপাতে যাবে ও।

একটু হেসে বললাম, যাবে যাক, তাতে তোর-আমার কী ?

—কিছুই নয় বলতে পারি না,—কাজল বললে, যতদিন যাবে, তত[illegible] বুঝতে পারবে ও,—আর ততই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে

উঠবে। আরো কতো পুরুষ যে পুড়ে মরবে ঐ আগুনে, কতো সংসার যে ছারখার হয়ে যাবে, তার ইয়ত্তা নেই। ও হয়ে উঠবে সমাজের বোঝাস্বরূপ, সমাজের বিভীষিকা-স্বরূপ।

—সুতনুকা ?

শৈলশিখর-প্রান্তের এক পার্বত্য পথে পদধ্বনি বেজে উঠল সুতনুকার পশ্চাতে,—অতি পরিচিত এক কণ্ঠস্বরও ভেসে এলো পেছন থেকে।

চলার গতি থামিয়ে ফিরে তাকালো সুতনুকা, সে কাছে আসতেই তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, কেন আমাকে ডাকছ তুমি পিছন থেকে ?

পাগলের মতো দৃষ্টি দেবদত্তের চোখে, বললে, কোথায় যাচ্ছ তুমি এ ভাবে ?

বলতে বলতে সে তার হাত ধরতেই সজোরে ছাড়িয়ে নিলো হাত সুতনুকা, বললে, নির্লজ্জ ! প্রত্যাখ্যানের লজ্জাও তোমাকে বেঁধে না ! সরে যাও এখান থেকে !

প্রস্তরখণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে থাকে দেবদত্ত, আর আবার আগের মতোই ছুটতে থাকে সুতনুকা,—ঝর্ণার মতো সে নামতে চায়, যেন মিশে যেতে চায় কোনো ফেনায়িত বিষ-সমুদ্রের মধ্যে !

কতো দণ্ড, কতো পল, কতো দিন, কতো রাত্রি চলে গেল। 'পাদ-প্রদীপ'-এর নাটক আরও জনপ্রিয় হয়েছে, আরও ডাক আসছে আমার নানাদিক থেকে। ধীরে ধীরে সত্যিই কি হয়ে যাচ্ছি আমি অন্য এক মানুষ ! প্রণবেশ একদিন এসে দেখা করেছিল এক ছায়াছবির স্টুডিওতে, বললে, খুব রোদে ঘুরেছি। চা খাওয়াও।

—তা খাওয়াচ্ছি, কিন্তু তুমি যে পাদপ্রদীপ ছেড়ে হঠাৎ একেবারে এখানে ?

বললে, কী আর করব ! তুমি ত সহজে ওদিকে দেখা দেবে না।

হেসে বললাম, কষ্ট হয় নাকি অদর্শনের ?

—হয় না ! প্রণবেশ গম্ভীর হয়ে বললে, তোমাকে শুধু আমি আবিষ্কারই করিনি, তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি !

—মানে !

আমার চোখে চোখ রেখে বললে, বাঁচাইনি ! প্রবীর আর নিশীথ মিলে সুবালাকে নিয়ে যা-খুসী করেছে, সব সহ্য করে গেছি, সুবালারও নির্লজ্জতা ক্ষমা করে গেছি। কেন জানো ? তোমার জন্য। যত ওসব ঘটবে, তত মন ভাঙবে তোমার, তত দূরে সরে যাবে তুমি। হয়নি কি তা ?

কতো দূর আর বলা যায় প্রণবেশকে, সংক্ষেপে শুধু বললাম, হ্যাঁ-তা হয়েছে।

ইজিচেয়ারটায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে প্রণবেশ আরামের সুরে বলে উঠলো, আ ! তোমার সুটিংয়ের আর দেরী কতো ? দেখতে এলাম যে !

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, না। আর দেরী নেই !

—তোমার প্রথম সট কাকে-কাকে নিয়ে ? আর্টিস্ট কে ?

বললাম, নিশীথকুমার।

চমকে প্রায় লাফ দিয়েই উঠে দাঁড়ালো প্রণবেশ, অ্যাঁ ! সুবালা নেই ত টিমে ?

—না। সে আমার ধারে-কাছেও নেই।

বলল, বাঁচালে। কিন্তু নিশীথটাকে আবার কেন ? একটা রটন্ এলিমেণ্ট্ ! ওকে টেনে এনেছ বুঝি তুমিই ?

একটু হেসে বললাম, বুঝেছ দেখছি।

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললে, খুব বাহাদুর !

বলেই গেটের দিকে চলা শুরু করল হঠাৎ। আশ্চর্য হয়েই ডেকে উঠলাম, প্রণবেশ !

হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দিলো, এ স্যুটিং আমি দেখব না। বাই-বাই।

সন্ধ্যার দিকে নিশীথ কাছে এসে বললে, দাদা, চললাম।

—কাজ হয়ে গেল ?

হ্যাঁ।

একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, নিশীথ, সুবালা কেমন আছে ?

একটু যেন চমকে গেল আমার এ প্রশ্নে, তারপরে বললে, ভালোই আছে।

বললাম, ওর ওখানেই যাচ্ছ ত ?

অপ্রতিভ ভঙ্গিমায় একটু হাসল প্রথমে, তারপরে লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে মুখ নীচু করে বললে, ঠিকই ধরেছেন আপনি।

বললাম, তোমার গান শুনি না অনেকদিন। একদিন তোমার বাড়ী গিয়ে শুনব।

কেমন-যেন কালো ছায়া খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে, বলল, গানটান আর গাই না।

অবাক হয়ে বললাম, কেন !

—সময় পাই না দাদা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বললাম, বুঝেছি। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো ?

—বলুন।

—শুনেছিলাম, সুবালাকে বিয়ে করবে বেণু মুখার্জী বলে কে-এক ভদ্রলোক। কথাটা কি সত্যি ?

হো-হো করে হেসে উঠল নিশীথ, বললে, সে একটা লোক মাঝে এসে খুব উৎপাত করেছিল বটে। এখন সরে গেছে ! বিয়ে-টিয়ে ও-সব বাজে কথা !

—ও !—বললাম।—যে বাড়ীতে থাকত, সেই বাড়ীতেই আছে ত এখন সুবালা ?

নিশীথ বললে, আপনি জানেন না, সেই বাড়ী থেকে উঠিয়ে দিয়েছে ওকে পাড়ার লোকেরা জোর করে। এখন ত আছে এই টালিগঞ্জে। কালিঘাটের কাছে। একটা টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে।

কিছুক্ষণ কোনো কথাই ফুটল না আমার মুখে, তারপরে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলাম, তাই নাকি !

—হ্যাঁ।

—এইখান থেকে থিয়েটারে যায় ?

—হ্যাঁ। মানে, আমার সঙ্গেই আর কী—

আশ্চর্য হয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি ! তুমি কি ঐখানেই থাকো নাকি ?

কিন্তু কী ভেবে বললাম না আর, শুধু বললাম, তোমার বাড়ীর খবর কী নিশীথ ? বৌমা—মানে, তোমার স্ত্রী, ভালো আছেন ত ?

—ভালো মানে, একটু থেমে নিশীথ বললে, টাইফয়েড হয়েছিল কিনা তারপর থেকে মাথাটা একটু কেমন যেন—

বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় বলে উঠলাম, থাক। তুমি যেতে পারো।

যেতে গিয়েও ফিরে এলো নিশীথ, ওর মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। কী অদ্ভুত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওর মুখ, ঠোঁট দুটিও কাঁপছে যেন মৃদু মৃদু। কী-একটা যেন আশঙ্কা করে বলে উঠলাম, কী হয়েছে নিশীথ ?

যেন টলতে-টলতে আমার টেবিলের ওপর এসে পড়ল, ধরল চেপে আমার একটা হাত, বলল, আমি আর একটা লাইনও গাইতে পারছি না কেন ? সে মন আমার গেল কোথায় ? আমার গলা বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে, জানেন দাদা

ধীরে ধীরে ওর হাত ছাড়িয়ে নিলাম, বললাম, এ প্রশ্ন যখন তোমার মনে জেগেছে, তুমি বেঁচে যাবে নিশীথ। গলা নষ্ট হবে না, নিয়মমত সাধলেই আবার ফিরে পাবে। কিন্তু তার আগে ফিরে পাওয়া চাই মন। বউমার কথা শুনে বড়ো দুঃখ হল, তিনি কী—

আমি থেমে পড়তেই ও উত্তর দিলো, চিকীৎসা ত হচ্ছে দাদা, হয়ত ভালো হয়ে যাবে।

লেকের ধারে—নিস্তরঙ্গ এক সরোবরের তীরে অনেক রাত অবধি চুপচাপ একা-একা বসেছিলাম মনে আছে। দেখিনি কখনো নিশীথের স্ত্রীকে, কিন্তু কেন যেন মনটাকে বারবার টানতে লাগল তাঁর কথাই, তাঁর এই হঠাৎ-মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণটাকে বারবার অনুধাবন করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে কখন নির্জন হয়ে গেল লেক, মাথার ওপরে একটা কাক 'কা-কা' করতে করতে একবার কী-জানি কেন উড়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো বাসায়। একটা বিরাট লম্বা রেলগাড়ী লৌহপথের ওপরে দাঁড়িয়ে অদূরের সোজা-হয়ে থাকা সিগন্যাল পাখাটার দিকে তাকিয়ে বারবার হুইসিল দিয়ে উঠছে তীব্রকণ্ঠে।

নিশীথ উদ্‌ভ্রান্তের মতো হন্তদন্ত হয়ে স্টুডিওতে আসে কাজ করতে, প্রায় দিনই হয়ে যায় দেরী। বলে, আপনি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেন, না?

আমি একটু হেসে চুপ করে থাকি। ও বলে, কাল থেকে আর দেরী হবে না, আপনি দেখবেন!

সেদিন বেলা চারটের সময়ই ওর কাজ শেষ হয়ে গেল। আমারও হাতে তখন কিছু সময় ছিল। ওকে টেনে নিয়ে এলাম, বললাম, এসো ঐখেনটাতে একটু বসি।

বসল। কিন্তু কেমন যেন অস্থির-অস্থির ভাব দেখলাম ওর মধ্যে একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে তোমার নিশীথ

একটু অপ্রস্তুতই যেন বোধ করতে লাগল সে, বলল, না, কিছু না ত দাদা, এবার যাব ?

—তাড়া আছে বুঝি ?

তেমনি অসংলগ্নভাবেই বলতে লাগল, তাড়া মানে…হ্যাঁ…মানে—

—সুবালার ওখানেই যাবে ত !

লজ্জিত ভঙ্গিমায় হেসে ফেলল, বলল, হ্যাঁ।

বললাম, সেত আছেই। একটু বসতেও ত পারো।

—পারি, মানে…

—কী ব্যাপার ঠিক করে বলো ত নিশীথ।

নিশীথ ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে উঠল, মানে ঐ রাস্কেল প্রবীরটা আবার—

—নিশীথ !—ধমকেই এবার উঠলাম আমি, একী কোনো সঙ্গীত-শিল্পীর মতো কথা হল !

উত্তরে কী বলতে গিয়েও বলল না সে, মুখ নীচু করে রইল।

ধীর, শান্তকণ্ঠেই বললাম, কতটুকু ভালবাস ওকে তুমি নিশীথ ?

মুখ তুলে গানের সুরে ঝংকার তোলার মতন করে বলতে লাগল, তা' বাসি। ওকে না দেখলে ভুবন অন্ধকার দেখি। ওর কথা না শুনলে, ওকে অনুক্ষণ কাছে না পেলে—

বলতে বলতে হঠাৎ দু'হাতে ঢেকে ফেলল মুখ, বলল, জানি এ অন্যায়, জানি এসব ভালো নয়, জানি আমি বিবাহিত, আমার পক্ষে,—কিন্তু কী করব আমি, কী করব !

দু'হাতের মধ্যে মাথাটা ঘস্‌তে লাগল সজোরে।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপে কাটিয়ে তারপর বলতে শুরু করলাম, 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে' গানখানা জানো ? পুরানো গান। নিধুবাবুর রচনা।

'গান' কথাটা কানে যেতেই মুখ তুলল, বললে, গান আমাকে গাইতেই হবে। আপনার কাজও হয়ে গেল। আর আমাকে ডাকবেন না। প্লিজ! আমি পালাবো! এ'দেশ ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায়!

একটু হেসে বললাম, এই না বললে সুবালাকে কাছে না পেলে—

বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি বিশ্বাস করুন, হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নয়ত সুইসাইড করতে হবে! এভাবে—

কথাটা শেষ করতে পারল না, আবেগে কণ্ঠ হয়ে গেল রুদ্ধ। একটা আকস্মিক অস্থির-ভঙ্গিমায় ও উঠে দাঁড়ালো, অস্ফুটকণ্ঠে কোনক্রমে বললে, আমি যাই, কেমন!

কিছু বললাম না আমি, চলে গেল নিশীথ।

সুবালা কেমন আছে, এই-ই ত ছিল আমার জিজ্ঞাস্য। কিন্তু নিশীথের বিপর্যস্ত মনকে পর্যবেক্ষণ করে সে প্রশ্নের উত্তর কী আমি পাইনি? পেয়েছি।

যোগিমারার শৈলতলে এক নিভৃত কুঞ্জের ধারে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল দুজনার। অসীম ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর-মন গেছে ভরে, কোনক্রমে বেপথু দেহভারটাকে বহন করে চলতে চলতে হঠাৎ-ই এক শিলাখণ্ডের ওপর বসে পড়ল সুতনুকা। কোন এক পুষ্পিত শাখার অন্তরালে মনের আনন্দে একাকী কূজন করে চলেছে যেন কোনো এক পাখী। পাখীর কূজন যেন দেবদত্তের কণ্ঠের কূজন হয়েই তাঁর শ্রবণে এসে লাগল,— এরই মধ্যে তুমি ক্লান্ত হলে সখী?

আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে দিয়ে শিলাখণ্ডের ওপরে মাথা রেখে ব্যাকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল সুতনুকা, বললে, আর যে আমি পারছি না! প্রভু আমার, বন্ধু আমার!

ছুটি বাহুলতা ধরে কে যেন বনস্পতির মতো তাকে আকর্ষণ করল,

—সুতনুকা !

—কে !

—কতো শীর্ণ তুমি হয়ে গেছো সুতনুকা ! কতো দুর্বল !

—কে !

মুহূর্তে ছিট্‌কে সরে দাঁড়ালো সুতনুকা, তীব্রকণ্ঠে বললে, কেন তুমি আমাকে স্পর্শ করলে ! কোন্ অধিকারে !

কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল দেবদত্ত, সুতনুকা ?

ক্রন্দনবিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল সুতনুকা, এ'বিষাক্ত দেহটা স্পর্শ করতে তোমার ঘৃণা হয় না ! সরে যাও—সরে যাও আমার সামনে থেকে !

—সুতনুকা ?

লুণ্ঠিত অঞ্চল, আলুলায়িত কেশ, সুতনুকা কাছে এসে দাঁড়ালো শিল্পীর, বললে, একটা অনুরোধ করব ? যতদিন এদেহে প্রাণ আছে, ততদিন আমাকে তুমি স্পর্শ করো না !

—কতো কঠিন এ দণ্ডাদেশ, জানো ?

—জানি !—সুতনুকা বলতে লাগল—আকাশে কতো নক্ষত্র—একে অপরের কাছে নেই, দূর থেকে আলোয়-আলোয় তারা কথা বলে ! দেখেছ কখনো ?

—দেখেছি !

—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কতো বিশাল ! তার কাছে কতো তুচ্ছ, কতো ক্ষুদ্র আমরা ! সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে, আমাদের এই ছোট ছোট মান, অভিমান, মোহ আর লোভের কোলাহল তুলে কেন সেই পরম শান্তি আমরা ভঙ্গ করব, দেবদত্ত ! তার থেকে প্রার্থনা কর, আগামী জন্মে আমরা যেন দুটি নক্ষত্র হয়ে জন্মাই, দুজনে

থাকব শত যোজন দূরে—আলোয় আলোয় আমরা কথা বলব। তুচ্ছ স্বার্থ, মোহ, আর সংঘাত তাতে একটুও মালিন্য সৃষ্টি করতে পারবে না!

গঙ্গার ধারে, যেখানে শূন্য একটা বয়া ছোট ছোট ঢেউয়ে উঠছে আর নামছে, ঝিলমিল করছে চাঁদের আলোয়, সেইদিকে তাকিয়ে একা বসে থাকতে থাকতে বোধহয় স্বপ্নের ঘোরই নেমে এসেছিল দুচোখ ভরে!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। রাত হয়ে গেছে অনেক। এবার ফিরতে হবে। সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে যদি ক্ষণকালতরে ক্লান্ত উর্বশীর তালভঙ্গ হয়, দেবরাজ করে না মার্জনা।

সেই বাড়ী সেই ঘর। রুণু তখনো ঘুমিয়ে পড়েনি ওর ভাইয়ের মতো। নিজেই এসে দরজা খুলে দিলো, বললে, তুমি এত দেরী করলে কেন বাবা! আমার ঘুম পায় না?

মাথায় হাত বুলিয়ে একেবারে কোলে তুলে নিলাম, এতক্ষণ ঘুমোওনি কেন মা?

—বারে, তোমার যে জন্মদিন। মা বললে, বাপী আসুক, বাপীকে প্রণাম করে তারপরে ঘুমোবি। ঝুনুও জেগে ছিল, এই একটু আগে ঘুমিয়ে পড়ল।

জন্মদিন! ঘরে এসে দেখতে পেলাম না আরতিকে, কিন্তু সত্যিই ত, ক্যালেণ্ডারের তারিখটা ভালো করে দেখতে দেখতে মনে পড়ল, আজ আমার জন্মদিনই বটে। কিন্তু মনে ছিল না একেবারেই।

টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা, আর লাল ফিতেয় বাঁধা একখানা বই। তাড়াতাড়ি বইখানা হাতে নিয়ে দেখি, বইখানা ইংরাজী, লাগেরভিস্টের 'বারাব্বাস'। 'বারাব্বাস' হচ্ছে সেই লোকটি, যার বদলে ক্ষমা আর প্রীতির প্রতিমূর্তি যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেকথা কি জানতো 'বারাব্বাস' প্রথমেই?

Barabbas is a hardened criminal, a man with a legacy of hatred against society. The gospel of love is meaningless to him." সত্যিকার প্রেম আর প্রীতি ছিল তার কাছে অর্থহীন। "Oh! God, Forgive them, for they do not know what they are doing"-খৃষ্টের এই উক্তির তাৎপর্য কি শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি একদিনও? প্রেম আর প্রীতিকে সে কি তারপরে অস্বীকার করতে পেরেছিল জীবনে? কেউ কি কোনদিন পেরেছে?

কিন্তু কে দিলো আমাকে এ বই? কার এ উপহার? আরতিই বা কোথায় গেল? তাড়াতাড়ি বইখানা খুলে দেখি, প্রথম পৃষ্ঠাটির ওপরে লেখা রয়েছে গোটা-গোটা অক্ষরে একটি মাত্র কথা—'জন্মদিনে'।— শরীরের সমস্ত রক্ত যেন এক মুহূর্তে সঞ্চারিত হল হৃদপিণ্ডে,—একী! এ কার হস্তাক্ষর, তাকে কি চিনতে আমার আর বাকী থাকতে পারে? রুণুকে দুহাতে ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে উঠলাম, কে এনেছে এ বই জানিস?

রুণু বললে, সন্ধ্যার পরে একটা লোক এসেছিল। সে-ই ত দিয়ে গেল এই ফুল আর বই।

কে এসেছিল! কার হাত দিয়ে সে পাঠালো এই উপহার! আর, কেনই বা পাঠালো?

ধপ্ করে বসে পড়লাম পাতা বিছানাটার ওপরে। যে-কথা আমার নিজের মনে নেই, যে-কথা আমার স্ত্রীরও নেই জানা, সে কথা এমন করে মনে রেখেছে কেন সে? আর কোনোবার ত উপহার দেবার এমন ঘটনা ঘটেনি, এবারেই বা ঘটলো কেন?

অনেকগুলি প্রশ্ন এলো মনের মধ্যে একসঙ্গে ভীড় করে। আমার জন্মদিনের তারিখটা কবে তাকে বলেছিলাম? বার বার ভাবতে চেষ্টা করলাম মনে মনে। বলেছি বলে একবারও ত মনে পড়ে না! তবে?

রুণু বললে, বাবা, খাবে না? মা এ-বেলা তোমার জন্য পায়েস তৈরী করেছে যে!

—কই তোমার মা?

—ছাদে।

—ছাদে! ছাদে কেন?

—কী জানি! দরজায় কড়া নড়ে উঠতেই মা ছুটে গেল ছাদে। আমাকে বললে, তুই খুলে দে রুণু।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, তুই ঘরে ভাইয়ের কাছে একটু থাক রুণু, আমি ছাদে যাচ্ছি।

অজস্র তারায়-ভরা আকাশ। চাঁদ নেই। আবছা অন্ধকারে আলসের ওপর ভর দিয়ে ছায়ার মতোই দাঁড়িয়ে ছিল আরতি। কাছে গিয়ে ধীর, কোমল কণ্ঠে ডাকলাম, আরতি?

নিরুত্তরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে নীচু হয়ে প্রণাম করল আমাকে। দুহাতে ওকে তুলে ধরে বললাম, ছাদে যে! নীচে চলো।

—যাচ্ছি।

বলে উঠলাম, জানতে না আমার জন্মদিন?

মাথা নেড়ে জানালো, না।

—আমি নিজেই জানতাম না, মানে, ভুলেই গিয়েছিলাম আর কি! কে দিয়ে গেছে ওসব?

মৃদুকণ্ঠে বললে, এক ভদ্রলোক। নাম বললেন, প্রবীরবাবু।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে পার করে দিয়ে অবশেষে বলে উঠলাম, কে পাঠিয়েছে জানো? সুবালা।

মুখ তুলে একবার তাকালো মাত্র, কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ আরো গেল কেটে। বললাম, যাবে না? ভাত দেবে না আমাকে!

—চলো।

রাত আরো গভীর হয়ে গেল, রুণু পড়ল ঘুমিয়ে। আমারও ধীরে ধীরে তন্দ্রার ঘোর নেমে এসেছে চোখে, হঠাৎ তপ্ত কপালটায় কার নরম আর শীতল স্পর্শ পেতেই চমকে জেগে উঠলাম।

মৃদু, অস্ফুট কণ্ঠে আরতি বললে, খুব রাগ করেছ আমার ওপর, না!

—না ত!

মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এসে তেমনি স্নিগ্ধ, কোমল কণ্ঠে বলে উঠল, তোমার কতো কষ্ট তা জানি, দেখে দেখে আমারও কষ্ট হতো, কিন্তু কি করবো আমি বলো ত!

টেনে নিলাম ওকে বুকের মধ্যে। কী আর করবে তুমি! আর কষ্টই বা আমার কিসের!

কান্নাভরা কণ্ঠে বললে, আমি তা জানি গো! পাছে আমি দুঃখ পাই, তাই তার দিক থেকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে অহরহ কাজে ডুবিয়ে রেখেছ!

একটু হেসে বললাম, না, তা নয়। কাজে ত আমাকে ডুবতেই হবে। এত যে কাজ হাতে নিয়েছি, তুমি খুশি হওনি দেখে!

মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

বললাম, তবে!

—তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বলে উঠলাম, না। বরং তুমিই আমাকে ক্ষমা করো।

'সবাই তোমরা আমাকে ক্ষমা করো সুর-গন্ধর্ব।' নিস্তব্ধ পর্বত-গুহার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ফিরতে লাগল দেবদত্তর জীর্ণ কণ্ঠস্বর,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ আর বিশ্ব, সবাই আমাকে ক্ষমা করে যাও। আমার প্রেম দিয়ে তাকে আমি তুলে আনতে পারিনি

অন্ধকার গহ্বর থেকে! যা কিছু তার হয়েছে, যা কিছু সে করেছে তা শুধু আমাকে বাঁচাবার জন্য! বিশ্ব-সত্যের আমি যদি কণামাত্রও হই, যদি কোথাও ফুটে থাকে আমার জীবনে সত্যের কোনো দীপশিখা, ত সেই পুণ্যের বিনিময়ে তাকে তোমরা ক্ষমা করো সবাই। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো!

দিন চার-পাঁচ মনটা বড়ো অস্থিরতায় ভরে ছিল সত্যিই। তখনো ফুলদানীতে শুকিয়ে যায়নি তার দেওয়া রজনীগন্ধা। একটি করে যেন শুভ্র ফুল ফুটে ওঠে, আর ফুটে ওঠে যেন তার মুখের সেই আমাকে চুপিচুপি ডাকা তার সেই গোপন নামটি ধরে—মিতা-মিতা-মিতু!

বোধ হয় সারাটা দিন জ্বরজ্বর ভাব নিয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিলাম, কী যেন এক অজানিত বেদনার ভারে মনটাও যেন ভার ভার ছিল মেঘলা দিনের মতো! বেশ মনে আছে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, হঠাৎ সদর দরজায় পড়ল কার ঘন ঘন করাঘাত। আরতি এসে বললে, কে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন তোমাকে!

সুশোভনকে যে এভাবে হঠাৎ আবার দেখতে পাবো কল্পনাও করিনি। সার্ট-প্যান্ট তখনো পরণে, শুধু মাথার চুল এলোমেলো, চোখ দুটো বসা, একটা প্রগাঢ় কালিমার ছাপ পড়েছে মুখে। আজও ভেবে অবাক হই, অতি শান্তভাবেই কেমন করে সব কিছু শুনে গেলাম তার মুখ থেকে, কেমন করে ঘরে ফিরে এসে শান্ত ভাবেই জামাটা টেনে নিলাম গায়ে। আরতি বোধহয় সব শুনেছিল দরজার আড়াল থেকে, বললে, রুণু ঝুনুকে ও-বাড়ীর ওঁদের কাছে রেখে আমি যাব তোমাদের সঙ্গে?

কিছুক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম ওর মুখের দিকে, বলেছিলাম, তুমি কেন?

অনুনয়ে ভেঙে পড়ল আরতি, যাই না গো ? তুমি অমত করো না। —চলো।

বোধহয় নিঃশব্দে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সী করেছিলাম। একটিও কথা বলিনি আমরা তিনজনে ট্যাক্সীতে বসে। শ্মশানেও এসে চুপচাপ বসেছিলাম একধারে। চাদর ঢাকা পড়ে আছে একটা খাটিয়ার ওপরে। কী-ই বা আর দেখব ? মর্গ থেকে কাটা-ছেঁড়া করে পাঠানো, কী-ইবা আছে ওর শরীরে আর ?

কেউ আসেনি! প্রবীরও নয়, নিশীথও নয়, কেউ-ই নয়। শুধু সুশোভন কী করে খবরটা পেয়ে ছুটে যায় তাড়াতাড়ি। সেই থেকে সবই ত সে করেছে। ভোরেই নাকি ঘটনাটা ঘটে। সারাটা দিন সুশোভনের নাকি কেটেছে পুলিশ আর মর্গ নিয়ে। বিষই পাওয়া গেছে পেটে, কণ্ঠনালী থেকে উদর পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া তীব্র বিষ। 'আমার মৃত্যুর জন্য ত্রিভুবনের কেউই দায়ী নয়!' এটা লিখে রাখা কাগজটা ছাড়া আর পাওয়া গেছে একখানা ডায়েরী। পুলিশের লোকটি চলে যাবার পর সব কিছু ব্যবস্থা করতে করতে এক সময় আমার হাতে সে দিয়ে গেল ছোট্ট ডায়েরীটা। কিন্তু আদৌ লেখা হয়নি ডায়েরীটা। শুধু প্রথম কয়েকটি পাতায় বড়ো বড়ো করে লেখা,—'আমার স্বামী'—'আমার স্বামী'—এরকম করে বারবার। শুধু শেষ 'স্বামী' কথাটা জড়িয়ে গেছে ভয়ানক। 'স্বামী' কথাটার পরে কোথাও কোনো নাম নেই। বারবার চেষ্টা করেও নামটা যেন সে লিখতে পারেনি। অজস্র যুদ্ধ করেছে মনের সঙ্গে, তবু শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেনি।

চিতা প্রজ্জ্বলিত হবার মুহূর্ত উপস্থিত। তাকালাম সুশোভনের দিকে। ততক্ষণে 'পাদপ্রদীপ' থেকে এসে পড়েছে সংবাদ পেয়ে প্রণবেশ, অঞ্জলি, কাজল, যতীনবাবুরা।

মুখাগ্নি করার সময় হঠাৎ আমার মধ্যে কী হল কে জানে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সুশোভনের হাত থেকে কেড়ে নিলাম কাঠিগুলো। বললাম, না ভাই, এটা অন্ততঃ আমাকে করতে দাও।

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল সবাই। আরতি থেকে শুরু করে কাজল পর্যন্ত।

চিতাভস্ম গঙ্গার জলে মিলিয়ে দিয়ে স্নানের পরে উঠে আসবার সময় পা পিছলে বোধহয় একটু পড়ে গিয়েছিলাম বাঁধানো ঘাটটার ওপরে। ওরা সবাই তাড়াতাড়ি ধরে ফেললো আমাকে। সবারই মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপরে বলে উঠলাম, তোমবা খুব অবাক হয়ে গেছো, না? আমি ওর মুখে মুখাগ্নি করতে গেলাম কেন, এর কারণটা তোমরা কেউ জান না, না? তবে শোনো। সুবালার আসল নাম—লতা। ও আমার স্ত্রী। রীতিমত অগ্নি-সাক্ষী করে বিবাহ!

একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠল ওদের মধ্যে। আর মুহূর্তের জন্য আমার মন চলে গেল পনের বছর পূর্বের একটা দিনে। সেই থামবসানো একটা বাড়ী। বসে আছেন লতার মা, সুব্রতদা বারবার ঘড়ি দেখছেন, পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চপ্রদীপ হাতে সেই পিতলের পুত্তলিকা,—আর পনেরো বছরের সেই লাল চেলিপরা নববধূর হাতখানি হাতে নিয়ে পুরোহিতের কণ্ঠে কণ্ঠস্বর মেলাচ্ছি,—যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম—।

ঐ 'পাদপ্রদীপ'-এরই তখন কর্ণধার ছিলেন সুব্রতদা, তাঁর স্নেহছায়ায় বসে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছিলাম নিজেকে। 'মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে, মিশাতেছি গান নদী কলরোলে, যোগ্য হতেছি কাজে।'—

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার শুরু করলাম। সুব্রতদা এক সন্ধ্যাবেলা ধরে নিয়ে গেলেন কাদের একটা বাড়ীতে। বললেন, নাবালিকা বলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে মেয়েটিকে, তুই এসে বাঁচা।

বলেছিলাম, সে আবার কী ?

—এ সব পল্লীর নিয়মকানুন তুই জানিস না। আয় তুই। পারবি না মেয়েটিকে বাঁচাতে বিয়ে করে ?

—বিয়ে !

হ্যাঁ, সবটা শুনে শেষ পর্যন্ত বিয়েই করে বসলাম। বাড়ীর কেউ জানে না ! লতার মা খুব স্নেহ করতেন, আমার ঠিকুজী চেয়ে নিয়ে তাব ছক টুকে রেখেছিলেন একটি কাগজে। কোন জ্যোতিষীকে দেখিয়ে বুঝি যোটক বিচার করাবেন, এই ছিল সাধ। লতারও আমি ছিলাম বোধ হয় চোখেব মণি। কিন্তু সবেরই ত একটা সমাপ্তি আছে ! আমার প্রথম জীবন আর যৌবনের সে স্বপ্নও একদিন হঠাৎ গেছে ভেঙে।

কী করে যে সমস্ত স্নেহ মিলিয়ে গিয়ে সুকঠিন একটা পাষাণে পরিণত হতে পারে মানুষ, তার প্রমাণ সেদিন পেয়েছিলাম লতার মায়ের মধ্যে। এক কথায় আমি অচিরেই বিতাড়িত হলাম, আর যা হয়, সে স্থানে অভিষিক্ত হলেন অন্য কেউ।

রাতারাতি সব ছেড়ে বোধ হয় পালিয়েই গেলাম কলকাতা থেকে। নানান্ চাকরী করেছি, আর সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, শেষ পর্যন্ত জাহাজের কাজ নিয়ে ভারতের বাইরেও। মধ্যে পরিচয় হয় আরতিদের সঙ্গে। বিবাহের কথা যখন উঠল, তখনো খোঁজ করেছি লতাদের। কিন্তু মেলেনি সন্ধান। তবু, পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছি।

দেখা হল শেষ পর্যন্ত পরিণত যৌবনে, এই 'পাদপ্রদীপ'-এই। প্রথম সাক্ষাতেই চিনতে পেরেছিলাম দুজনকে দুজনে। কিন্তু তখন ও অপরের স্ত্রী, আমি অপরের স্বামী। কী হবে পরস্পরের সেই অতীত সম্পর্ক তুলে সংসার-প্রাঙ্গনে ঝড় তুলে ? কী-ই বা লাভ ?

সম্পর্ক স্বীকার করিনি আমরা, কিন্তু মন কী মেনেছিল তাই বলে ?

বাড়ী ফেরার পথে গাড়ীতে বসে কাঁদছিল আরতি, আমাকে জানাওনি কেন বলো ত? আমি কি তাঁকে এ ভাবে যেতে দিতাম?

ম্লান হেসে বললাম, পারতে না রাখতে।

আরতি বললে, তখন কি এ সব জানি? সেই যে এসেছিল একদিন বাড়ীতে? রুণু ঝুনুকে কতো আদর করল কোলে বসিয়ে। আমার হাত দুটো ধরে সেই যে 'দিদি' বলে ডাকল, চোখ দুটো যেন ছলছল করে এসেছিল কথা বলতে বলতে। আদর করে আমার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল, বলেছিল, দিদি গো, আমাকে ভুলে যাবে না ত কোন দিন?—সেই ওর প্রাণভরা 'দিদি' বলে ডাকা, সে যেন এখনো কানে এসে বাজছে!

'পাদপ্রদীপ'-এর এক কোণে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের ওপর দুঃসাহসী হাতে দুজনের নাম রেখেছিলাম খোদাই করে। আজ থেকে দু হাজার বছর পরে, সে যুগের মানুষ যদি কোনদিন সীতাবেঙ্গা-যোগিমারার ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করবার মতো এখানেও এসে পড়ে আজকের দিনের স্মৃতিপুঞ্জের কোনো-না-কোনো অংশকে আবিষ্কার করতে, তা হলে হয়ত চোখে পড়বে আমাদের নাম,—হয়ত তারা আমাদের কথা বারবার ভাববে, হয়ত কল্পনায় রচনা করবে আমাদের এই বিচিত্র ভালবাসার কাহিনী,—যেমন করে আজকের দিনের মানুষ হয়ে আমি এঁকে গেলাম যোগিমারার সেই লিপি-কাব্য, 'সুতনুকা নাম দেবদাসীক্যি তম্ কামযিথ বালানশেয়ে দেবদীনে নাম লুপদখে!
